সহজ পাঠ

তৃতীয় ভাগ

বিশ্বভারতী

XII Ben
184.5
vol.3
36537

XII Ben.164.5
36537

TAGORE (Sir Rabindranath)

[Sahaja pāṭha. A reader, by Rabindranath Tagore and others. Bengali text.]

সহজ পাঠ

তৃতীয় ভাগ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা

সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ রায়
শান্তিনিকেতন। বীরভূম

বিশ্বভারতী পাঠভবনের ষষ্ঠ খ বর্গের পাঠ্য

প্রকাশ চৈত্র ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯
তৃতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৩৫২, মাঘ ১৩৫৪, কার্তিক ১৩৫৬, আষাঢ় ১৩৫৮
পৌষ ১৩৫৯

SCHOOL OF ORIENTAL & AFRICAN STUDIES
Accession No.: 36537
Shelf Mark:

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তিপ্রেস। ২৭।৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট। কলিকাতা
৪'১

গান : সার্থক জনম আমার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
সর্দার মশাই	শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী	২
তালগাছ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬
গণ্ডার-শিকার	শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন	৮
বর্বর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩
শহুরে ইঁদুর ও গেঁয়ো ইঁদুর	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস	১৪
ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮
শিশির, কুয়াশা, মেঘ ও বৃষ্টি	শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত	১৯
রবিবার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২
তেলে আর জলে	শ্রীক্ষিতীশ রায়	২৩
রাজা ও রানী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৬
বরফের দেশ	শ্রীক্ষিতীশ রায়	২৭
নৌকাযাত্রা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১
জয়তিলক	শ্রীতয়নেন্দ্রনাথ ঘোষ	৩২
মোটা কেঁদো বাঘ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৭
গাছের বীজ কী করে ছড়ায়	শ্রীপুণ্যময় সেন	৩৯
গান : আমরা চাষ করি আনন্দে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৩
আবদুল মাঝির গল্প	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৪
ভুলুরাম শর্মা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৬
কুকুর সম্বন্ধে দু-চার কথা	শ্রীতনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৮
সমব্যথী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫২
মেঘমালা	শ্রীক্ষিতীশ রায়	৫৩
পথহারা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৮
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬০
গান : মেঘের কোলে রোদ হেসেছে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৫
স্বরলিপি : মেঘের কোলে রোদ হেসেছে		৬৬

গান

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালোবেসে।

জানি নে তোর ধন রতন
আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।

কোন্ বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।

আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়াল,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে।

সর্দার মশাই

একটি ছোট্ট গ্রাম। সেখানে কয়েক ঘর লোক বাস করত। তারা দিনের বেলা যেত কাজকর্ম করতে, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গল্প শোনাত। গ্রামের বাইরে ঘন পাতায় ভরা একটা বড়ো গাব গাছ ছিল। সেই গাছে যখন লাল লাল কচি পাতা বের হত, গাঁয়ের লোকে সেই পাতা দিয়ে তরকারি রেঁধে মনের সুখে খেত। তার পর আবার যখন ফল ধরত তখন গাঁয়ের ছেলেদের আনন্দ দেখে কে। ফল পাকলেই তারা দল বেঁধে গাছের তলায় হাজির। কেউ-বা উঠত গাছে, কেউ-বা থাকত তলায়। পাকা পাকা গাব পেড়ে, যত ইচ্ছে খেয়ে, আবার কোঁচড় ভ'রে বাড়ি নিয়ে যেত।

গ্রাম থেকে একটু দূরে একটা বন। সেই বনে নানারকম পশু, রঙ-বেরঙের পাখি থাকত, আর থাকত এক দল বাঁদর। বাঁদরগুলো মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে উৎপাত করতে এসে, লোকের কাছে তাড়া খেয়ে পালিয়ে যেত বটে, কিন্তু কলাটা মুলোটা যা পেত নিতে ভুলত না।

বাঁদরগুলো যেদিন সেই গাব গাছের সন্ধান পেল সেদিন থেকে তার ফলের উপর তাদের লক্ষ রইল। ফল পাকতে না পাকতেই, বাঁদরের দল সব দিত নিকেশ করে। বাঁদর খুব চালাক হয় কিনা, তাই গাঁয়ের লোক কাজে কর্মে বেরিয়ে গেলেই তারা এসে গাছে দিত হানা। ছোটো ছোটো ছেলে, কী আর করে, মনের দুঃখে দেখত, চোখের সুমুখেই তাদের সাধের ফলগুলি বাঁদরে খেয়ে ফেলছে।

শেষে বিরক্ত হয়ে গাঁয়ের মোড়ল গাছের তলায় একজনকে পাহারায় বসিয়ে দিলেন। বাঁদররা পড়ল মুশকিলে, গাছের কাছে আসতে সাহস হয় না,

পাহারাদারের হাতে তীরধনুক। অথচ, পাকা ফলের লোভে তাদের মন করছে ছট্‌ফট্‌। শেষে বাঁদরের দল বুদ্ধি করে রাত্রে এসে চুরি করে ফল খায় আর ভোর না হতেই বনে পালিয়ে যায়। তখন তো আর পাহারা থাকে না।

বাঁদরদের যে দলপতি তাকে সবাই ডাকত 'সর্দার' ব'লে। সর্দার খুব ভালো লোক। সে বললে, "রাতের বেলা কোথাও যাওয়া বাঁদুরে শাস্ত্রে নিষেধ। তোমরা রাতে বেরিয়ো না। বনে তো ঢের ফল আছে, তবে কেন মানুষের ফল খাওয়া। এখন থেকে যদি তোমরা সাবধান না হও, তবে তোমাদের কপালে

বিপদ আছে বলছি।” সর্দারের কথা কেই-বা শোনে। তারা তাকে অগ্রাহ্য করে যেতে লাগল। সর্দার কিন্তু তাদের সঙ্গে না গিয়ে রাতের বেলা বনেই used to থাকত।

এ দিকে গাঁয়ের লোকে বাঁদরদের দুষ্টুমি টের পেয়ে গেল। তারা সকলে একজোট হয়ে পরামর্শ ক'রে ঠিক করল যে, গভীর রাতে গাঁয়ের সকলে মিলে চুপিচুপি গাছ ঘেরাও ক'রে অপেক্ষা করবে। বাঁদরেরা রাতে ভালো দেখতে পায় না, তাই খুব সুবিধে হবে। যেই ভোর হতে আরম্ভ করবে অমনি সকলে মিলে আচ্ছা করে বাঁদর ঠেঙাবে।

পরদিন ভোরে বাঁদরেরা দেখল, গাব গাছের চারি দিকে লোকে লোকারণ্য। তাদের হাতে আবার তীরধনুক, লাঠিসোঁটা। ভয়ে তাদের প্রাণ গেল উড়ে। এখন পালাবার উপায় আর নেই। সকলেই বলতে লাগল, সর্দারের কথামতো চললেই ভালো হত। ভেবে আর কী হবে। ঘাবড়ে গিয়ে বাঁদরের দল চেঁচামেচি আরম্ভ করল, আর চারি দিক থেকে ইঁট পাটকেল আর তীর হুহু ক'রে গাছের উপর এসে পড়তে আরম্ভ হল। বাঁদরদের কারো-বা গেল মাথা কেটে, কারো-বা গেল হাত-পা বিঁধে। তারা আরো চেঁচাতে লাগল। নীচে নামলেই ঘাড়ে পড়ে মোটা লাঠির বাড়ি।

ও দিকে বনের ভিতর সর্দার সেই চীৎকার শুনতে পেয়ে ভাবলে, নিশ্চয়ই দলের কোনো বিপদ ঘটেছে। সে ধাঁ ক'রে উঠে পড়ল একটা খুব উঁচু গাছে। সেখান থেকে ব্যাপার দেখেই তার চক্ষুস্থির। এখন কী করা যায়। সর্দার ভাবল, “এদের বাঁচাবার একটা উপায় করতেই হবে, নইলে আমি কিসের সর্দার।” তক্ষুনি সে লাফ দিয়ে চলে গেল গ্রামের মধ্যে। সেখানে এক বাড়িতে একটি বউ উনুন ধরিয়ে রান্নার জোগাড়ে গেছে। সর্দার করলে কী, গোয়াল থেকে এক আঁটি খড় এনে উনুনের আগুনে ধরিয়ে নিয়ে লাগিয়ে দিল ঘরের

চালে। ব্যস, বেধে গেল লঙ্কাকাণ্ড। এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে, এমনি ক'রে চালে চালে গেল আগুন লেগে।

তখন গাঁয়ের লোকের কাছে খবর ছুটল, আগুন লেগেছে। বাঁদর-ঠেঙানো গেল ঘুচে। যে যত জোরে পারল দৌড় দিল গাঁয়ের দিকে। দেখতে দেখতে গাব গাছের চারি দিক একেবারে খালি। বাঁদরেরা হাঁফ ছেড়ে প্রাণপণে লম্বা লাফ-ঝাঁপ দিতে দিতে ঢুকল বনে। সর্দার এসে খুব একচোট বকুনি দিয়ে তাদের বললে, "হতভাগারা, বড়ো ভাগ্যে আজ রক্ষে পেয়ে গেলি। খবরদার! আর কক্ষনো গাঁয়ের দিকে যাবি নে।"

তাল গাছ

তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।

মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
একেবারে উড়ে যায়—
কোথা পাবে পাখা সে।

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার

মনে মনে ভাবে বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।

সারাদিন ঝর্‌ঝর্‌ থথর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও—

মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি—

যেই ভাবে,   মা যে হয় মাটি তার,

ভালো লাগে আরিবার

পৃথিবীর কোণটি।

গণ্ডার-শিকার

খুব বড়ো একটা কাজ করে এলে আমরা বলি, মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। শিকারীরা জানে গণ্ডার শিকার করা কেমন শক্ত কাজ। ভাণ্ডার লুট করবার মতোই তাতে বিপদ অনেক।

গণ্ডার-শিকারের প্রধান বিপদ গণ্ডারের গোঁ, একবার চাপলে তার কাছে যায় সাধ্য কার। শিকারীকে দেখতে পেলে প্রথম সে চেষ্টা করে পালাতে। কিন্তু পালাতে গিয়ে যখন সে বোঝে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো শক্ত, তখন সে মুখ ঘুরিয়ে শিকারীর দিকে ফিরে দাঁড়ায় সোজা হয়ে। কিছুক্ষণ থাকে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। তার পরেই নাকের খড়্গ বাগিয়ে সোজা ছুটে আসে শিকারীর দিকে। বন্দুকের গুলিতে তাকে কাবু করতে পারলে শিকারী বেঁচে যায়। যদি সে ভয় পায়, বা হাতের বন্দুক যদি একবার কাঁপে, কি গুলি ছুঁড়তে যদি একটুও দেরি হয়, কিংবা গুলি যদি বেজায়গায় গিয়ে লাগে, তাহলে শিকারীর আর রক্ষা থাকে না। গণ্ডার তখন শিকারীর ঘাড়ের উপর প'ড়ে খড়্গের গুঁতোয় তাকে ছিঁড়ে ফেলে।

গণ্ডারের গায়ে যেখানে-সেখানে গুলি করলে কিছুই হয় না। তাদের গায়ের চামড়া যেমন পুরু তেমনি শক্ত। সেই চামড়ায় লেগে জোরালো বন্দুকের গুলিও ফিরে আসে। যারা ভালো শিকারী তারা গুলি করে গণ্ডারের মাথায় দু চোখের মাঝখানে, অথবা তার ঘাড়ে। সেরকম জায়গায় গুলি লাগলে এক গুলিতেই গণ্ডার শেষ।

সিংহ, বাঘ বা বনের অন্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য গণ্ডারের অস্ত্র তার খড়্গ, যেমন তাতে ধার তেমনি তা শক্ত। এই খড়্গ কোনো

কোনো গণ্ডারের থাকে ছুটি ক'রে, কারো-বা থাকে একটি। ভারতীয় গণ্ডারের খড়্গ একটি, আর আফ্রিকার গণ্ডারের ছুটি।

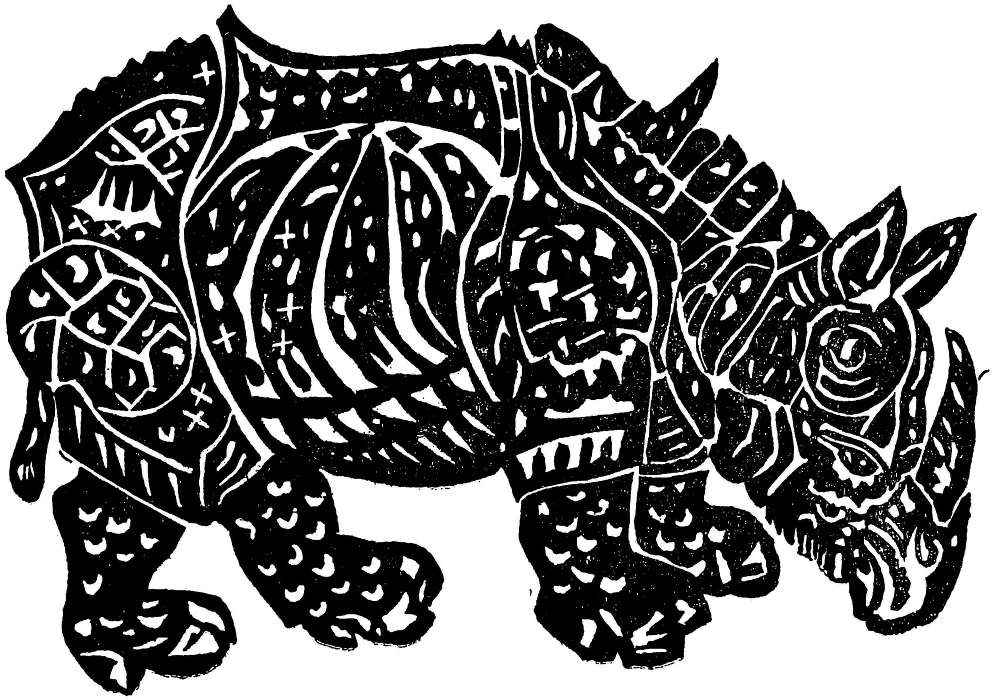

এই খড়্গটি এক অদ্ভুত জিনিস। শুনলে অবাক হবে, গণ্ডারের খড়্গ আগাগোড়া লোম দিয়ে তৈরি। লোমগুলি আছে পরস্পরের গায়ে মিশে অত্যন্ত আঁট হয়ে। তাতেই শক্ত হয়েছে হাড়ের মতো। খড়্গটি কিন্তু হাড় নয়, নাকের উপর বসানো আছে আলগাভাবে। শিমুল গাছের কাঁটা যেমন শিমুলের ছালের উপর আলগা বসানো থাকে, এও তেমনি। গণ্ডার মেরে

চার-পাঁচ দিন ফেলে রাখার পর যদি খড়্গ ধরে টান দেওয়া যায়, তাহলে মাথা থেকে খড়্গটি আলগা হয়ে উঠে আসে।

গণ্ডারের চামড়াও খুব অদ্ভুত জিনিস। এমন শক্ত, এমন পুরু চামড়া অন্য কোনো জন্তুর নেই। ভারতীয় গণ্ডারের চামড়া দু ভাঁজ হয়ে পিঠে লেগে থাকে। আফ্রিকার গণ্ডারের চামড়া এমন ভাঁজ-করা নয়—মোষের চামড়ার মতো নিটোল। গণ্ডারের চামড়া দিয়ে ঢাল তৈরি হয় খুব চমৎকার। প্রাচীন কালের অনেক লড়িয়ে লোক গণ্ডারের ঢাল ব্যবহার করত। এখনো আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা লড়াই বা শিকারের সময় এই ঢাল ব্যবহার ক'রে থাকে।

আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা গণ্ডার শিকার করে তার চামড়া ও মাংসের লোভে। গণ্ডারের খড়্গও তাদের কাছে খুব আদরের জিনিস। এই খড়্গ দিয়ে তারা তলোয়ারের বাঁট তৈরি করে। সে বাঁট দেখতেও যেমন সুন্দর শক্তও হয় তেমনি। কিন্তু, খড়্গ ও চামড়ার চেয়ে গণ্ডারের মাংসের প্রতিই অসভ্যদের বেশি লোভ। একটা গণ্ডার শিকার করতে পারলে সেদিন তাদের পল্লীতে আনন্দের ধুম পড়ে যায়। তখন তিন-চার দিন ধ'রে চলে নাচ গান বাজনা আর ভোজ।

অসভ্যেরা গণ্ডার শিকার করে কেমন ক'রে? তাদের তো বন্দুক নেই—তীর ধনুক ও বর্শাই তাদের প্রধান অস্ত্র। একটা-দুটো তীর বা বর্শা গায়ে বিঁধলে গণ্ডারের কিছুই হয় না। তাই তারা বুদ্ধি খাটিয়ে এক উপায় বের করেছে। খুব শক্ত একটা দড়ির মাথায় বাঁধে একটা বেশ ভারী কাঠ, অন্য মাথায় লাগায় একটা ফাঁস। সেই দড়িটা তারা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রাখে গণ্ডারের চলার পথে। যদি গণ্ডারের পা কোনো রকমে দড়ির ফাঁসে আটকা পড়ে তাহলে গণ্ডার-মশায় পড়েন বাঁধা। দড়ির অন্য মাথায় অত্যন্ত ভারী একটা

কাঠ বাঁধা থাকায় ছুটতেও পারে না। আবার এমনও হয়, ছোটবার সময় দড়ি-বাঁধা কাঠটা জঙ্গলের মধ্যে গাছের গুঁড়িতে যায় আটকে। শিকারীরা কাছেই কোথাও ঝোপের আড়ালে থাকে লুকিয়ে। যেমনি গণ্ডার ফাঁদে পড়া অমনি তারা হৈ-হৈ রৈ-রৈ ক'রে ছুটে আসে। চারি দিক থেকে তার উপর তীর ও বর্শা পড়তে থাকে আর বেচারা চীৎকার করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণ হারায়। তখন দা কুড়ুল নিয়ে শিকারীর দল লেগে যায় মাংস কাটতে। কেউ কেউ আবার কাঠ জড়ো ক'রে আগুন জ্বালে। ভিড় জমে যায়। আগুনে ঝলসানো গণ্ডারের মাংস দিয়ে মস্ত ভোজ হয়।

বর্বর

বর এসেছে বীরের ছাঁদে,
বিয়ের লগ্ন আটটা—
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
গালেতে গালপাট্টা।

শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জ'মে,
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।

শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয়—"ঠাট্টা"।

শহুরে ইঁদুর ও গেঁয়ো ইঁদুর

এক শহুরে ইঁদুরের সঙ্গে এক গেঁয়ো ইঁদুরের বন্ধুত্ব ছিল। এক দিন গেঁয়ো ইঁদুর ভাবলে, "অনেক দিন আমার বন্ধুকে দেখিনি। একবার তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে মন্দ হয় না।" আবার ভাবলে, "কিন্তু আমি তো শহরের পথঘাট চিনিনে। যাই বা কী ক'রে! তার চেয়ে বরং এক কাজ করা যাক। তাকেই এখানে আসতে চিঠি লিখে দি।" এই ভেবে গেঁয়ো ইঁদুর চিঠি লিখল, "বন্ধু, অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। আমার চিঠিখানা পেয়েই তুমি চলে আসবে। তোমার নেমন্তন্ন রইল। আসবে আসবে।"

চিঠি লিখেই তার ভাবনা হল, "এই যা, এখন এটা পাঠাই কী ক'রে।" গেঁয়ো ইঁদুর থাকত এক গেরস্তের গোলাবাড়িতে। তার উঠোনের এক কোণে ছিল এক আমলকী গাছ। সেই গাছে থাকত বুলবুলি। তার সঙ্গে ইঁদুরের খুব ভাব। আমলকী-তলায় গিয়ে ইঁদুর ডাকল, "বুলবুল, বুলবুল-ভাই।"

বুলবুলি বললে, "আরে ইঁদুর-দাদা যে! এসো এসো, কী খবর।"

ইঁদুর বললে, "বুলবুল-ভাই, একটা কাজ করে দেবে ভাই? বড্ড মুশকিলে পড়ে গেছি। চিঠিখানা দিয়ে আসবে শহরে?"

বুলবুলি বললে, "নিশ্চয়ই, এক্ষুনি যাচ্ছি। কই চিঠি।"

ইঁদুর চিঠি দিল। বুলবুলি তা ঠোঁটে ক'রে নিয়ে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে চলে গেল।

শহুরে বন্ধু আসবে। গেঁয়ো ইঁদুর তার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শহরের মতো ভালো জিনিস তো আর গ্রামে পাওয়া যায় না। তবু ওরই মধ্যে যেখানে যা ভালো জিনিস পেল ইঁদুর তাই জোগাড় করতে লাগল। দু-তিন রকমের কলাই, হরেক রকমের ডাল, ভুট্টা, দু-চার

টুকরো পুরোনো পিঠে, কয়েকটি বাদাম, এমনি কত কী সে সারা রাত্তির ধ'রে জোগাড় করল। পরদিন দুপুর বেলা বুলবুলি ফিরে এল। ইঁদুর বললে, "কী বুলবুল-ভাই, খবর কী।"

বুলবুলি বললে, "দিয়ে এলাম চিঠি। সে আজ রাত্তিরেই আসবে।"

ইঁদুর খুশি হয়ে আর যা যা আয়োজন বাকি ছিল তাই করতে লাগল। রাত আটটা-নটার সময় শহুরে ইঁদুর এসে পৌঁছল। অমনি গেঁয়ো ইঁদুর ব্যস্ত হয়ে "এসো এসো, কত দিন পরে তোমায় দেখলাম," বলে তাকে বসতে দিল একখানা সুন্দর কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ি। তার পর দুই বন্ধুতে অনেক গল্প হল। গেঁয়ো ইঁদুর বললে, "এবার তোমার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করি ভাই। বড্ড রাত হয়ে গেছে।" ব'লে পাত পেতে দিয়ে বন্ধুকে ডাকল, আর যত কিছু খাবার সংগ্রহ করেছিল সব এনে সাজিয়ে দিল। খাবারের নমুনা দেখেই তো শহুরে ইঁদুরের নাক কুঁচকে উঠল। সে এটা সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। আর, মাঝে মাঝে এটা থেকে এক কামড়, ওটা থেকে এক কামড় খেতে লাগল। গেঁয়ো ইঁদুর বারবার বলতে লাগল, "পাড়াগাঁয়ে তোমাদের পাতে দেওয়ার মতো কিছুই পাওয়া যায় না। এ-সব জিনিস তোমাদের ভালো লাগবে না। জানি, শহরে তোমরা কত ভালো জিনিস খাও। কিন্তু কী করবে ভাই, বন্ধুর জন্য এক দিন একটু কষ্ট করতেই হবে। ও কী। তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না হে। সব প'ড়ে রইল যে। না না, এই পিঠেখানা খেতেই হবে।"

ইচ্ছে না থাকলেও বন্ধুকে খুশি করবার জন্য শহুরে ইঁদুর একখানা ফুলুরি নিয়ে খেতে খেতে বললে, "তা যাই বলো ভাই, তোমরা এই পাড়াগাঁয়ে যে কী করে দিন কাটাও আমি তা ভেবেই পাইনে। এখানে না পাওয়া যায় ভালো খাবার, না আছে থিয়েটার বায়স্কোপ, না আছে ভালো পথঘাট গাড়িঘোড়া। আইসক্রীম নেই, মালাই-বরফ নেই, রেডিও নেই, এমন কী

গ্রামোফোনও নেই। তোমরা কী ক'রে থাক বলো তো। আমি হলে এক দিনও টিকতে পারতাম না, তা তুমি যাই বলো-না কেন।"

গেঁয়ো ইঁদুর বললে, "যা বলছ মিথ্যে নয়, ভাই। তবে কী জান, আমাদের সয়ে গেছে। আমাদের এখানে থাকতে কষ্ট হয় না।"

শহুরে ইঁদুর বললে, "চলো-না হে আমার সঙ্গে শহরে, দেখবে কত মজা। তোমার আর গাঁয়ে ফিরতে ইচ্ছে করবে না।"

গেঁয়ো ইঁদুরের অনেক দিন থেকেই শহরে যাবার লোভ ছিল। তাই বন্ধুর কথায় সহজেই রাজি হল। ঘরদোর গুছিয়ে পরের দিন সন্ধ্যার সময় দু বন্ধুতে রওনা হল। তারা যখন পৌঁছল তখন রাত প্রায় একটা। শহুরে ইঁদুর যেখানে থাকে সেটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ বললেই হয়। মার্বেল পাথরের মেঝে। সব ঝক্‌ঝক্‌ তক্‌তক্‌ করছে। দেয়ালে কত রঙবেরঙের ছবি; কোথাও আবার প্রকাণ্ড আয়না। শহুরে ইঁদুর এ-ঘর ও-ঘর ক'রে দেখাতে লাগল আর বলতে লাগল, "কেমন লাগছে হে।" গেঁয়ো ইঁদুর বলে, "চমৎকার।"

তার পর শহুরে ইঁদুর বন্ধুকে খাবারের ঘরে নিয়ে গিয়ে গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। গেঁয়ো ইঁদুর দেখলে, টেবিলের উপরে নানা রকমের খাবার পড়ে আছে—সেদিন সন্ধেয় একটা ভোজ হয়ে গেছে, তারই সব বাড়তি জিনিস। এত রকমের খাবার গেঁয়ো ইঁদুর কোনোদিন দেখেনি। চপ কাটলেট থেকে আরম্ভ করে আইসক্রীম সন্দেশ পর্যন্ত কোনো জিনিসই বাদ পড়েনি।

শহুরে ইঁদুর এক-এক ক'রে বন্ধুর সামনে সব এগিয়ে দিলে। তার পর নিজেও এসে কাছে বসে বললে, "এবার আরম্ভ করো হে।" গেঁয়ো ইঁদুর খাবে কী, এ-সব দেখেই তো তার চক্ষুস্থির। কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন এ-সব সে অনেকবার খেয়েছে। শহুরে ইঁদুর "এটা খাও, ওটা খাও" ব'লে বারবার তাকে অনুরোধ করতে লাগল।

তাদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় খট্ ক'রে সামনের দরজাটা গেল খুলে। আর সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন লোক সেই ঘরে ঢুকল, তাদের সঙ্গে একটা কুকুর। থিয়েটার দেখে তারা বাড়ি ফিরেছে। তাদের দেখেই তো ইঁদুর দুটি ভয়ে দিল ছুট। কিন্তু, যাবে কোথায়। ধারে কাছে কোনো গর্ত-টর্তও নেই যে ঢুকে পড়বে। এদিকে ইঁদুর দেখে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে গর্জে উঠল। সামনে ছিল একটা কৌচ। ইঁদুর দুটি প্রাণের ভয়ে তার নীচেই ঢুকে পড়ল। ভয়ে তখনো তাদের বুক টিপ্ টিপ্ করছে। কুকুরটা এক-একবার গর্জে ওঠে আর ইঁদুর দুটো ভয়ে থর্থর্ করে কাঁপতে থাকে। এমনি ক'রে অনেকক্ষণ কাটল, তারপর লোক ক'টি চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও গেল। ঘরে যখন আর সাড়াশব্দ নেই তখন গেঁয়ো ইঁদুর প্রথমে মুখ বাড়িয়ে দেখল কেউ কোথাও আছে কি না। দেখল, ঘর একেবারে খালি; তখন সে শহুরে ইঁদুরের কানে কানে বললে, "বন্ধু, এমন ভয়ে ভয়ে প্রাসাদে থেকে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে আমাদের গোলাবাড়িতে নিশ্চিন্ত মনে কলাই আর বাসি পিঠে খাওয়া অনেক ভালো। নমস্কার বন্ধু, তোমার শহরের ভালো নিয়ে তুমি থাকো। আমি গাঁয়ের ইঁদুর গাঁয়েই ফিরে যাচ্ছি।"

ভয়

উজ্জ্বলে ভয় তার, ভয় মিট্‌মিটেতে ;
ঝালে তার যত ভয় তত ভয় মিঠেতে।
ভয় তার পশ্চিমে, ভয় তার পুর্বে ;
যে দিকে তাকায় ভয় সাথে সাথে ঘুরবে।
ভয় তার আপনার বাড়িটার ইঁটেতে ;
ভয় তার অকারণে অপরের ভিটেতে।
ভয় তার বাহিরেতে, ভয় তার অন্তরে ;
ভয় তার ভূত-প্রেতে ভয় তার মন্তরে।
দিনের আলোতে ভয় সামনের দিঠেতে ;
রাতের আঁধারে ভয় আপনারি পিঠেতে।

শিশির, কুয়াশা, মেঘ ও বৃষ্টি

সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, পুকুর—এ-সব থেকে জল সব সময় বাষ্প হয়ে হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে। হাওয়ার ভিতর যে জলের বাষ্প রয়েছে তা সহজেই দেখানো যায়। একটি কাঁচের গ্লাসের মধ্যে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে দিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে, ঐ গ্লাসের বাইরের দিকে বিন্দু বিন্দু জলের কণা জড়ো হয়েছে। শুকনো কাপড় দিয়ে গ্লাসটাকে মুছে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আবার ছোটো ছোটো জলের কণা এসে সেখানে জমা হয়। এ-সব জলের কণা এল কোথা থেকে। ভিতরে বরফ থাকায় গ্লাসটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়। গ্লাসের চার দিক ঘিরে তার কাছাকাছি যে হাওয়া আছে গ্লাসের গায়ে লেগে সেই হাওয়া তখন ঠাণ্ডা হতে থাকে। আস্তে আস্তে গ্লাসটা যখন একটা বিশেষ মাত্রায় ঠাণ্ডা হয় তখন তার সংস্পর্শে এসে হাওয়ার জলীয় বাষ্প আর বাষ্প-আকারে থাকতে পারে না, জ'মে জলের কণায় পরিণত হয়। এইজন্যই আইসব্যাগে বরফ পুরে দিলে তার বাইরের দিকটা ভিজে ওঠে, মনে হয় যেন ব্যাগটার গায়ে ফুটো আছে, ভিতরের বরফ-জল ঐ ফুটো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ব্যাগে বরফ বা খুব ঠাণ্ডা জল না থাকলে তার বাইরে কিন্তু কোনো জল জমতে দেখা যায় না। এর থেকেই বোঝা গেল, হাওয়ায় জলের বাষ্প মিশে আছে। এই জলীয় বাষ্প একেবারে স্বচ্ছ, তাই চোখে দেখতে পাই না।

শীতের রাতে ঘাসের উপর, গাছের পাতায়, আমরা শিশির জমতে দেখি। দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপে মাটি গরম হয়, সূর্য অস্ত গেলে তাপ ছেড়ে দিয়ে ঐ মাটি ঠাণ্ডা হতে থাকে। শীতকালে শেষরাত্রির দিকে ঐ মাটি এতটা ঠাণ্ডা হয়

যে, তার সংস্পর্শে এসে হাওয়ার জলীয় বাষ্প জ'মে গিয়ে জলের কণার আকারে জমা হতে থাকে ঘাসে ও গাছের পাতায়। এই জলকণাকেই আমরা বলি শিশির। মাটির উপরেও শিশির পড়ে, মাটি ঐ জল শুষে নেয় ব'লে তা আর আমরা দেখতে পাই না। কখনো কখনো হাওয়ার ভিতরকার জলীয় বাষ্প খুব ছোটো ছোটো জলের কণায় জমে গিয়ে মাটির কাছে হাওয়ার উপর ভেসে বেড়ায়। একেই বলি কুয়াশা, খুব নিচু মেঘও একে বলা যায়। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে পৃথিবী সূর্যের উত্তাপ পায় অনেক বেশি, তাই রাত্রিতে মাটি এতটা ঠাণ্ডা হয় না যাতে তার গায়ে ঠেকে জলের বাষ্প জ'মে জল হতে পারে। এইজন্যই গ্রীষ্মকালে শিশির পড়ে না। আয়নার উপর আলো পড়লে সেই আলো যেমন ফিরে আসে, মেঘের গায়ে ঠেকে তাপও তেমনি ফিরে আসে। রাত্রিতে মাটি তাপ ছেড়ে দেয়, উপরে উঠতে গিয়ে ঐ তাপ মেঘের গায়ে বাধা পেয়ে আবার মাটিতেই ফিরে আসে। মেঘলা দিনে তাই গরম বোধ করি। মাটি যতটা ঠাণ্ডা হলে তাতে শিশির জমতে পারে, আকাশে মেঘ থাকলে ততটা ঠাণ্ডা হয় না, তাই শিশিরও পড়ে না।

শুকনো হাওয়ার চেয়ে জলের বাষ্প অনেক হালকা, তাই জল বাষ্প হলে সেই বাষ্প ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে যায়। মাটি থেকে যতই উপরে উঠে যায় হাওয়া ততই ঠাণ্ডা হতে থাকে ; বেলুনে ও এরোপ্লেনে চড়ে যাঁরা অনেক উঁচুতে উঠেছেন তাঁদের কাছ থেকে এ খবর আমরা জেনেছি। জলের বাষ্প উপরে উঠলে ঠাণ্ডা হতে থাকে, তার পর এমন একটা সময় আসে যখন ঐ ঠাণ্ডায় বাষ্প জ'মে ছোটো ছোটো জলের কণা হয়ে হাওয়ার উপর ভেসে বেড়ায়। এইভাবে অসংখ্য জলের বিন্দু সৃষ্টি হয়ে হাওয়াতে ভাসতে থাকে। এই ভাসন্ত জলের কণাগুলিকে আমরা বলি মেঘ। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে এই মেঘের গায়ে লাগলে অনেকগুলি জলের কণা একত্র হয়ে বড়ো বড়ো জলের

ফোঁটায় পরিণত হয়। এই ফোঁটাগুলি তখন এত ভারী হয় যে হাওয়াতে ভেসে থাকতে পারে না, পৃথিবীর টানে নেমে আসে মাটির উপর—আমরা বলি বৃষ্টি হচ্ছে। যে জল মাটির উপরে থাকে, বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে গিয়ে সেখানকার ঠাণ্ডায় জ'মে সে জল আবার মাটিতেই ফিরে আসে।

রবিবার

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি মস্ত হাওয়া-গাড়ি ?
রবিবার সে কেন, মা গো, এমন দেরি করে।
ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে সকল বারের পরে।
আকাশ-পারে তার বাড়িটি দূর কি সবার চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মতো গরিব-ঘরের মেয়ে ?

সোম মঙ্গল বুধের খেয়াল থাক্‌বারই জন্যেই,
বাড়ি ফেরার দিকে ওদের একটুও মন নেই।
রবিবারকে কে-যে এমন বিষম তাড়া করে,
ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন আধ ঘণ্টার পরে।
আকাশ-পারে বাড়িতে তার কাজ আছে সব চেয়ে ?
সে বুঝি, মা, তোমার মতো গরিব-ঘরের মেয়ে ?

সোম মঙ্গল বুধের যেন মুখগুলো সব হাঁড়ি,
ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে যেম্‌নি উঠি জেগে,
রবিবারের মুখে দেখি হাসিই আছে লেগে।
যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে মোদের মুখে চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মতো গরিব-ঘরের মেয়ে ?

তেলে আর জলে

শের শা'র আমলে জৌনপুর শহরে এক মস্ত নামজাদা কাজী ছিলেন। সেকালে কাজীই ছিলেন বিচারক। জৌনপুরের এই কাজীর নাম ছিল শেখ জালালউদ্দীন। লোকে বলত, অমন কাজী নাকি হয় না। বাদশা বেগম, বান্দা বাঁদী—কাজীর চোখে ছিল সকলেই সমান। বে-আইনী কাজ করলে তাঁর হাত থেকে নিস্তার পাবার জো ছিল না। তিনি কেবল যে আইন জানতেন ভালো তা নয়, দোষগুণ বিচার করবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। জালালউদ্দীনকে সবাই যেমন ভয় করত তেমনি ভক্তিও করত। জৌনপুরের ছেলে বুড়ো সকলে বলত,—

"খোদা আছেন স্বর্গপুরে,
জালাল আছে জৌনপুরে।"

প্রতি সন্ধ্যায় নমাজের পর তিনি শহরের অলিতে গলিতে বেড়াতে বেরোতেন। যে পথে তিনি যেতেন চোর জোচ্চোর সে পথ মাড়াতে ভয় পেত। একদিন তিনি বাজারের রাস্তায় তাঞ্জাম চ'ড়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন, একটি ছোটো ছেলে, হাতে তার একটি তেলের ভাঁড়, পথের ধারে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। জালালউদ্দীনের হুকুমে একজন পেয়াদা গিয়ে ছেলেটিকে এনে হাজির করল। কাজী জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী, কাঁদছ কেন।" কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটি বলল, "হুজুর, আমি কলুর ছেলে। এক ভাঁড় তেল বেচে ন'টা পয়সা পেয়েছিলাম। বাড়িতে আটা বাড়ন্ত। ভেবেছিলাম, ঐ পয়সা দিয়ে কিছু কিনে নিয়ে যাব। কিন্তু, সারাটা দিন মেহনত ক'রে ভারি কাহিল হয়ে পড়ে-ছিলাম। তাই গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; ওই পাথরের উপর ভাঁড়টা

ছিল। জেগে দেখি, ভাঁড় রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে যে পয়সা রেখেছিলাম তা আর নেই। আমি কী ব'লে বাড়িতে মুখ দেখাই, হুজুর! আমার সর্বনাশ হ'য়ে গেল।"

এই ব'লে বেচারি খুব কাঁদতে লাগল।

তাকে ধমক দিয়ে কাজী বললেন, "তুমি তো আচ্ছা বেকুব হে। আরে, ওই পাথরটার উপর রেখেছিলে তো, তবে তো পাথরই চোর। আনো বেটাকে বেঁধে।"

শহরময় খবর ছড়িয়ে গেল যে, কাজীর আদালতে একখণ্ড পাথরের বিচার হবে চুরির দায়ে। এমন মজার বিচারের কথা কেউ কক্ষনো শোনেনি। আদালত খুলতে না খুলতে সারা জৌনপুর যেন ভেঙে পড়ল।

কাজী তাঁর কুর্সিতে বসেছেন। এক দিকে তাঁর কলুর ছেলে, অন্য দিকে সেই পাথর। সেপাই, পেয়াদা, উকিল, পেশকার, লোকজনে আদালত সরগরম। কাজী দাড়িতে একবার আঙুল বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পাথর, সত্যি বলো, চুরি করেছ?"

পাথর নাকি আবার জবাব দিতে পারে! তিন-তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর কাজী হুকুম দিলেন, বিশবার কোড়া মেরে পাথরের ছালচামড়া তুলে দিতে।

শহরের লোকেরা ভাবল, ভালো রে ভালো, এ এক মন্দ রগড় নয়। এ ওর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে আর ফিসফিস করে বলে, "কাজী সায়েবের মাথা খারাপ হল নাকি।" একদল বাজারের লোক ছিল সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে। তারা আর হাসি চাপতে পারল না।

আদালতে হাসাহাসি করা ভয়ানক বে-আদবি। ইচ্ছা করলে এজন্যে কাজী দণ্ডও দিতে পারেন। জালালউদ্‌দীন রেগে উঠলেন। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে যে-তিনজন হাসছিল পেয়াদারা তাদের গ্রেফ্‌তার ক'রে আনল। কাজী বললেন যে, বে-আদবির জন্য তিনি ওই তিনজনকে তিন দিন কয়েদখানায় আটক রাখবেন।

তারা তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় ক'রে বলল, "হুজুর, কসুর হয়েছে। এবারকার মতো কেবল জরিমানা নিয়ে মাপ করতে আজ্ঞা হয়।"

কাজী বললেন, "আচ্ছা, তাই হবে।"

কাজীর হুকুমে একজন পেয়াদা গিয়ে এক বাটি জল নিয়ে এল। কাজী আসামী-তিনজনকে বললেন যে, প্রত্যেককে ওই বাটির ভিতর চারটা পয়সা ফেলতে হবে। প্রথম দু'জন নিজের নিজের জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেল। তৃতীয় লোকটি যেই-না একটি পয়সা জলে ফেলেছে অমনি কাজী হেঁকে উঠলেন, "ব্যস, হয়েছে। বাঁধো একে, এই বেটাই চোর।"

সে-লোকটা কিছুতেই মানবে না সে চুরি করেছে। তখন কাজীর হুকুমে পেয়াদারা তার পয়সার থলে উপুড় ক'রে দেখে ঠিক আর আটটা পয়সা রয়েছে —তেলচিটে। তেলচিটে ছিল ব'লেই তো জলের উপর তেল ভেসে উঠেছিল আর তাইতেই কাজী বুঝতে পারলেন, চোর কে। কলুর ছেলে তার ন' পয়সা ফেরত পেয়ে হাসিমুখে বিদায় হ'ল। চোর গেল কয়েদখানায় পেয়াদার গুঁতো খেতে খেতে।

আদালত থেকে ফেরার পথে শহরের লোকেরা কাজীর বুদ্ধির খুব তারিফ করতে লাগল, বলল—

"খোদা আছেন স্বর্গপুরে,
জালাল আছে জৌনপুরে।"

রাজা ও রানী

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।

ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলুম ছুটে,
দেখতে ডালিম গাছে
বনের পিরভু কেমন নাচে।
ডালে ছিলেম চ'ড়ে,
সেটা ভেঙেই গেল প'ড়ে।

সেদিন হ'ল মানা—
আমার পেয়ারা পেড়ে আনা,
রথ দেখতে যাওয়া,
আমার চিঁড়ের পুলি খাওয়া।

কে দিল সেই সাজা,
জান' কে ছিল সেই রাজা ?

এক যে ছিল রানী
আমি তার কথা সব মানি।

সাজার খবর পেয়ে
আমায় দেখল কেবল চেয়ে।
বললে না তো কিছু,
কেবল মুখটি ক'রে নিচু
আপন ঘরে গিয়ে
সেদিন রইল আগল দিয়ে।

হ'ল না তার খাওয়া,
কিম্বা রথ দেখতে যাওয়া।
নিল আমায় কোলে
সাজার সময় সারা হ'লে।
গলা ভাঙা-ভাঙা,
তার চোখ-দুখানি রাঙা।

কে ছিল সেই রানী
আমি জানি জানি জানি।

বরফের দেশ

শীতকালে যখন উত্তুরে হাওয়া দেয়, সমস্ত শরীর হী-হী ক'রে কাঁপতে থাকে, মনে হয় সারাক্ষণ ব'সে ব'সে আগুন পোহাই অথবা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি, সেই সময় একবার বরফের দেশের কথা ভাবতে চেষ্টা কোরো।

পৃথিবীর উত্তর সীমায় সুমেরুপ্রদেশ। প্রায় সারা বৎসর সে-দেশ বরফে ঢাকা। শুনে অবাক হবে, সুমেরুপ্রদেশের অনেক জায়গায় একটি দিন ও একটি রাতেই বছর যায় ঘুরে। সূর্য সেখানে একটানা ছ মাস দেখা দিয়ে বাকি ছ মাস একেবারেই দেখা দেয় না।

বরফের দেশ এক মজার দেশ; যত উত্তরে যাও দেখবে, গাছপালা যেন খুবই কম চোখে পড়ছে। তবে যদি মনে কর যে সে-দেশে জীবজন্তু নেই, মানুষ নেই, তাহলে ভুল করবে। সীল, সাদা ভালুক, সিন্ধুঘোটক ইত্যাদি অনেক অদ্ভুত জীবজন্তুর বাস হ'ল সুমেরুপ্রদেশে। নানা জাতের লোকও থাকে সেখানে।

গ্রীন্‌ল্যাণ্ড্‌ সুমেরুপ্রদেশের একটি অংশ। এখানকার বেশির ভাগ লোকই হ'ল এস্‌কিমো জাতের। এস্‌কিমোরা ছোটোখাটো দেখতে, অনেকটা ল্যাপ্‌চাদের মতো। তেমনি লেপা-পোঁচা চেহারা, চ্যাপটা নাক ও নরুন-চেরা চোখ। ওদের পোশাকও অদ্ভুত। রোঁয়াসুদ্ধ সীলের চামড়ার জামা পাজামা, হাঁটু অবধি জুতো, মাথায় লোমের টুপি, হাতে চামড়ার দস্তানা। স্নান ওরা বড়ো একটা করে না। গোরু যেমন বাছুরকে চেটে পরিষ্কার করে, এস্‌কিমো মাও তেমনি তার শিশুকে চেটেচুটে পরিষ্কার ক'রে দেয়। ওরা তো শাকসবজি বলতে গেলে পায়ই না। মাছ মাংস খেয়ে থাকে।

এস্‌কিমোরা যাতায়াত করে এক ধরনের গাড়ি চ'ড়ে, তার নাম স্লেজ। এ গাড়ির চাকা নেই, দেখতে অনেকটা দু-মাথা-ওয়ালা নৌকোর মতো। শক্ত

বরফের উপর দিয়ে সাঁ সাঁ ক'রে ছুটে চলে। গাড়ি টানে ও-দেশী কুকুর, গায়ে তাদের ঘন লম্বা রোঁয়া, ঝাঁকড়া লেজ। আমরা যেমন আট ঘোড়ার গাড়ি বলি, ওরা তেমনি বলে আট কুকুরের স্লেজ। এই কুকুর ছাড়া এস্কিমোদের একটি দিনও চলে না।

এই তো গেল ডাঙার যানবাহনের কথা। এস্কিমোরা যে-নৌকো চ'ড়ে মাছ-শিকারে বেরোয়, সেও এক মজার জিনিস। এই নৌকোর নাম কাইআক্। লম্বায় প্রায় আট-দশ হাত, আর মাঝখানে মাত্র হাত-দেড়েক চওড়া। নৌকোর কাঠামোটা কাঠের, আগাগোড়া চামড়ায় মোড়া। একজনের বেশী এক নৌকোয় বসতে পারে না। বসার জায়গা অদ্ভুত, মাঝখানে একটা গোল ফোকোর—তাইতেই পা দুটো ঢুকিয়ে বসতে হয়।

গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ যে ছ মাস সূর্যের দেখা পাওয়া যায় সেই সময়টা, এস্কিমোদের কাজের অন্ত থাকে না। ছেলেরা কাইআক্ চ'ড়ে মাছ ধরে। বড়োরা বর্শা হাতে সীল সিন্ধুঘোটক ইত্যাদি শিকার করতে বেরোয়। বর্শায় একটা দড়ি বাঁধা থাকে। সীল যখন আরামে সমুদ্রের ধারে রোদ্দুর পোহায় তখন শিকারী গুঁড়ি মেরে কাছাকাছি এগিয়ে যায়। জলে ডুব দিয়ে লুকিয়ে পড়ার আগেই সীলকে ঘায়েল করা চাই। শীতকালে শিকার করতে হয় অন্য উপায়ে। সীল নিশ্বাস নেয় ফুসফুসের সাহায্যে, মাছের মতো কান্‌কোর সাহায্যে নয়। শক্ত বরফের মধ্যে কতকগুলো ফুটো ক'রে সীল লুকিয়ে থাকে। যেই সীল নিশ্বাস নেবার জন্য ভেসে ওঠে অমনি শিকারী বর্শা ছুঁড়ে তাকে বিঁধে ফেলে। বর্শার গায়ে যে-দড়ি বাঁধা তারই সাহায্যে শিকার টেনে তোলে। এস্কিমোরা কেবল যে সীলের মাংস খায় তা নয়, তার চর্বি দিয়ে তারা আলো জ্বালায়, লোম ও চামড়া দিয়ে জামা-কাপড় তৈরি করে।

one should dry
গ্রীষ্মকালে মাছ মাংস রোদ্‌দুরে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকনো মাছ ও মাংস এস্‌কিমোদের শীতের দিনের খাবার, আগে থেকে জোগাড় ক'রে রাখা দরকার। এ-সময়টা তারা থাকে চামড়ার তৈরি তাঁবুতে, তার নাম টুপিক।
beforehand

শীতকাল যখন আসে, তখন বরফের দেশের অন্য-এক রূপ। বরফ জ'মে পাথরের মতো কঠিন হয়ে পড়ে, চার দিক অন্ধকার, আর সোঁ সোঁ ক'রে হিমেল হাওয়া বইতে থাকে। টুপিকে থাকলে তখন আর শীত মানে না, তাই অন্য ধরনের বাড়ি তৈরি করতে হয়। এস্‌কিমোরা শক্ত বরফ কেটে নেয় টালির আকারে। টালির পর টালি সাজিয়ে বাড়ি তৈরি হয়। এই বরফের বাড়ির নাম ইগ্‌লু, দেখতে অনেকটা উপুড়-করা বাটির মতো। আমরা তো চুন-সুরকির মশলা লাগিয়ে ইঁটের সঙ্গে ইঁট জুড়ি, ওরা তেমনি বরফের টুকরো ছিটিয়ে দেয়। এই টুকরোগুলো টালির ফাঁকে ফাঁকে জ'মে গেলেই হাওয়া ঢোকার পথ একেবারে যায় বন্ধ হয়ে। ওরা জানালা তৈরি করে স্বচ্ছ একখণ্ড বরফের টুকরো দিয়ে। দরজা ফুটিয়ে ওরা বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা করে এক মজার উপায়ে। চার-পাঁচ হাত লম্বা একটা সুড়ঙ্গ-পথ পেরিয়ে তবে দরজা। বাড়িতে ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। ইগ্‌লু পাঁচ-ছ হাতের বেশি উঁচু হয় না। বাড়ির ভিতর একটি পাথরের তৈরি প্রদীপ জ্বলে। তার শলতে সমুদ্রের শ্যাওলা দিয়ে তৈরি, আর তেল হল সীলের চর্বি। চার দিক বন্ধ, তাই ওই একটি আলোতেই সারা ঘর গরম হয়ে থাকে।
to stand cold

সুমেরুপ্রদেশের বিচিত্র শোভা হ'ল মেরুজ্যোতি। এই জ্যোতি দেখা দেয় শীতকালে। যে ছ মাস সূর্যের দেখা পাওয়া যায় না, সেই সময়ে মেরুজ্যোতিই বরফের দেশে সামান্য একটু আলো দেয়। প্রথমে দেখা দেয় একটা হলুদ-রঙা রামধনু। তার পর এই আলোর নীচে একটি একটি ক'রে লাল নীল সবুজ বেগনি রঙের পাড় বসতে থাকে। বিচিত্র রঙের ছটা সারা

আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো অন্ধকার ঠেলে আলোর একটা বিরাট ঢেউ খেলে যায়। কখনো আবার পাতলা আলোর পর্দা নাচের ভঙ্গিতে দুলতে থাকে। হঠাৎ আলোর খেলা থেমে যায়, অন্ধকারে দেখা দেয় সরু একটা আলোর রেখামাত্র। আবার তেমনি হঠাৎ সারা আকাশ আলোকিত হয়ে পড়ে এক অপরূপ দীপ্তিতে।

মেরুজ্যোতির বিচিত্র আলোর নীচে এস্‌কিমোদের গ্রামকে দেখায় শ্বেত-পাথরের তৈরি ঘুমন্ত মায়াপুরীর মতো। মনে হয়, সূর্যের আলোর সোনার-কাঠির ছোঁয়া লেগে সব যেন আবার জেগে উঠবে।

নৌকাযাত্রা

মধু মাঝির ঐ যে নৌকোখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো,
বোঝাই-করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা—
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে,
আমি কেবল যাই একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

তখন তুমি কেঁদো না মা যেন
ব'সে ব'সে একলা ঘরের কোণে,
আমি তো মা যাচ্ছি নাকো চলে
রামের মতো চোদ্দ বছর বনে।
আমি যাব রাজপুত্র হয়ে
নৌকো-ভরা সোনা মানিক বয়ে,
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে,
আমরা শুধু যাব মা তিন জনে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

ভোরের বেলা দেব' নৌকো ছেড়ে,
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে ;
দুপুরবেলা তুমি পুকুরঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তির্‌পুর্ণির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে—
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

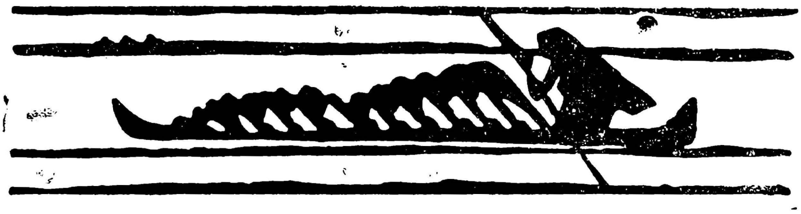

জয়তিলক

মানুষের বাড়িঘর থেকে অনেক দূরে একটা খুব উঁচু পাহাড়। একটা যেন বিরাট মানুষ, তারই কোমর বেড়ে লেগে রয়েছে এক ভারি বন। পাহাড়টা এত ঢালু যে বনের একেবারে উপর থেকে একখানা বড়ো পাথর একটু যদি জায়গা-নড়া ক'রে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে সে-পাথর গড়াতে গড়াতে, এক পাথরের ঘাড়ের উপর দিয়ে, আর-এক পাথরের গা ঘেঁষে, ভয়ানক আওয়াজ করতে করতে কোথায় গিয়ে কী যে চাপা দেবে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। এই বনে বড়ো বড়ো গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে ডালপালা ছড়িয়ে। গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে এমন ঠেসাঠেসি ক'রে যে, এক গাছের ডালের ভিতর দিয়ে চলে গেছে আর-এক গাছের ডাল এঁকে-বেঁকে। কী ঠাস-বুনুনির কাজ। পাতাগুলি সব একটার ঘাড়ে আর-একটা এমনি চেপে বসেছে যে, কোনো ফাঁক দিয়ে যে রোদ ঢুকবে, সে জো'টি নেই। দিনেও আঁধার। নীচে মাটি আর পাথর আছে জড়াজড়ি ক'রে, তবে মাটিকে পাথর রেখেছে এমন দাবিয়ে যে পায়ের তলায় নরম কিছু ঠেকে না। এমনি মাটির উপর দিয়ে নেমে গেছে গোটাকতক ঝরনা সেই পাহাড়ের নীচের দিকে।

এইরকম একটা ঝরনার ধারে ছিল এক বাঘের ঘর। বাপ, মা আর তাদের একটা ছানা থাকত সেই ঘরে। এরা ডোরাকাটা বাঘ নয়, গায়ে এদের চাকা চাকা দাগ। এ-বংশের বাঘ সে-বনে বেশি ছিল না। অত বড়ো বন, তাতে ও-বংশের ঐ একটিই শিশু। বাপ-মা আদর করে নাম রেখেছিলেন কুলতিলক। সারা গায়েই তার তিলক কাটা। কুলতিলক রোজ সকালে উঠেই তার গায়ের তিলক গুনত। তার তো আয়না ছিল না। ঘাড়ের, পিঠের

আর অমনি সব জায়গার দাগ গুনবে কী ক'রে। গিয়ে বসত ঝরনার ধারে, ঝরনাই তার আয়না। সে গুনে দেখেছিল, তার গায়ে সাতশো পঁচিশটা ফোঁটা। অত ফোঁটা গায়ে ধরে এমন জীব সে-বনে দুটি ছিল না।

একদিন তার মার কাছে ব'সে কথা বলছিলেন এক বাঘিনী, গায়ে তার ডোরা ডোরা দাগ। তাঁকে দেখেই কুলতিলক এসে বসল কাছে। ওঁদের কথা সে কিছুই শুনছে না। একবার গিয়ে বসছে বাঘিনীর ডান দিকে, আবার গিয়ে বসছে বাঁ দিকে; এই আছে সামনের দিকে, তড়াক্ ক'রে একটু লাফিয়ে পরক্ষণেই আবার পিছন দিকে। ওর রকমটা বাঘিনীর চোখে মোটেই ভালো ঠেকছিল না। তিনি বড়ো ঘরের মেয়ে, বড়ো ঘরের বউ, চালচলন নিখুঁত।

মনে মনে ভাবলেন, এ ছানাটা বে-আদব। আর নাই বা হবে কেন। চিতাবাঘের ছানা তো।

তিনি চলে যেতে মা কুলতিলককে বললেন, "দেখলে তো বাছা, যেমন বংশ তেমনি চালচলন।" কুলতিলক বলে উঠল, "পাঁচশো ষাট।" মা বললেন, "সে কী, কী পাঁচশো ষাট।" ছানা বললে, "গায়ের ডোরা।"

এমন ক'রে সে-বনে যত ফোঁটাকাটা আর ডোরাকাটা জানোয়ার ছিল, ও সবারই ফোঁটা আর ডোরা গুনে দেখেছিল। ওরই সব চাইতে বেশি।

একদিন কে এসে বললে, "বনের একেবারে শেষ দিকে এক চিতা আছে, তার গায়ের তিলক গুনে শেষ করা যায় না।" সে চিতাটি ছিল আর-এক জাতের, তবু সেই বনেই তো সে থাকে। একদিন দেখা হল দুজনার। দুজনই দুজনার চার ধারে ঘুরতে লাগল। এ গোনে ওর দাগ, ও গোনে এর। মুখে কারও কথা নেই। কেবল একমনে গুনছে আর ঘুরছে। একবার, দুবার, তিনবার গোনা হয়ে গেল। দুজনারই সাতশো পঁচিশ। কুলতিলক আরও একবার গুনতে চায়। দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে, আর গোনা গেল না।

রাতে ঘুম নেই, দিনে ভাবনার আর পার নেই। খাওয়া কমে গেছে, দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি, কিছুই আর নেই। শরীর রোগা হয়ে গেছে, বাপ-মার হয়েছে ভাবনা। তাঁরা তো কিছুই জানেন না, ও তো কাউকে কিছু বলেনি। দিনের পর দিন সেই ঝরনার জলের ধারে বসে থাকে; একবারের পর আর-একবার, তার পর আবার একবার গুনেই চলেছে, সে গোনার আর শেষ নেই। কোনো রকমে একটা দাগ কি বাড়বে না, একটা ছোটো দাগ, এতদিন চোখে পড়েনি এমন একটা। ঝরনার জল তো একেবারে কাঁচের মতো, এতটুকু ঢেউ নেই, একটুও ঘোলা নয়, তবু একটাও নূতন দাগ ধরা পড়ল না।

মনের দুঃখে বনের ভিতর ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল সে অনেক দূর। চোখও দেখছে না, কানও শুনছে না, শুধু পা'ই চলছে। পথে সজারু জিরাফ এরা সব মুচকে হাসল। সবাই জেনে ফেলেছিল যে, বনে আর-একজনের গায়েও সাতশো পঁচিশ দাগ। আরও খানিকটা পথ গেলে কতকগুলি নারকেল গাছ এসে পড়ল। তাতে বসেছিল ক'টা বাঁদর। তাদের একজন সেই উপর থেকে ঠিক সময় বুঝে দিল ছেড়ে এক নারকেল। পড়ল সেটা কুলতিলকের মাথায়, দুটো চোখের ঠিক মাঝখানে।

এমনি ক'রে সকলের কাছে উপহাস পেয়ে মনের দুঃখ বেড়েই গেল। আর বেড়াবার শখ রইল না। চুপ ক'রে ফিরে এল বাড়িতে। সারা রাত ধ'রে মাথার বেদনায় ছটফট করল। সকালবেলা উঠেই আবার সেই ঝরনার ধার। জল টল্‌টল্ করছে, তলার পাথর বালি সব যেন উঠে এসেছে জলের উপর। মানুষের ঘরের আয়না ঘসামাজা ক'রেও অমন চক্‌চকে হয় না। এমনি জলে মুখের ছবি যেমন পড়া অমনি কুলতিলকের সারা গায়ে কিসের যেন চমক লাগল। কপালের ঠিক মাঝখানে যে-তিলক দেখল সে গায়ের আর-সব তিলককে ছাড়িয়ে গেছে। যেমন বড়ো তেমনি কালো।

একটুও দেরি না ক'রে সে সোজা চলে গেল সেই সাতশো-পঁচিশ-ফোঁটা চিতার বাড়ি। গিয়ে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের ডান পা'টা তুলে কপালের দিকে ফিরিয়ে ধীর গলায় বললে, "সাতশো পঁচিশের উপরে আরও এক।"

মোটা কেঁদো বাঘ

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।
এক ছুটে পালাল বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ ক'রে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।
ঢেকিশালে পুঁটু ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়াল সেখানে।

ফুলিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, "চাই গ্লিসেরিন সোপ।"
পুঁটু বলে, "ও কথাটা কী যে
জন্মেও জানিনে তা নিজে।
ইংরেজি টিংরেজি কিছু
শিখিনি তো, জাতে আমি নিচু।"
বাঘ বলে, "কথা বল ঝুঁটো,
নেই কি আমার চোখ দুটো।
গায়ে কিসে দাগ হল লোপ
না মাখিলে গ্লিসেরিন সোপ।"

পুঁটু বলে, "আমি কালো কৃষ্টি,
কখনো মাখিনি ও-জিনিসটি।
কথা শুনে পায় মোর হাসি,
নই মেম-সাহেবের মাসি।"
বাঘ বলে, "নেই তোর লজ্জা।
খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।"
পুঁটু বলে, "ছি ছি ওরে বাপ,
মুখেও আনিলে হবে পাপ।
জান না কি আমি অস্পৃশ্য,
মহাত্মা গাঁধিজির শিষ্য।
আমার মাংস যদি খাও
জাত যাবে, জান না কি তাও।
পায়ে ধরি করিয়ো না রাগ।"

"ছুঁস নে ছুঁস নে," বলে বাঘ,
"আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,
বাঘনাপাড়ায় বদনাম
রটে যাবে ; ঘরে মেয়ে ঠাসা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা
দেবী বাঘা চণ্ডীর কোপে।
কাজ নেই গ্লিসেরিন সোপে।"

গাছের বীজ কী ক’রে ছড়ায়

ফাল্গুন-চৈত্রের দুপুরবেলার হাওয়ায় বুড়ির-সুতো উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে দু-একটা উড়ে ঘরের ভিতরেও চলে আসে। দেখতে পেলেই ছেলেমেয়েরা ছোটে ফু দিয়ে ওড়াবার জন্য। এদের হাতে নিলে দেখা যায় যে, এরা এক-একটি বীজ এবং তারই গা থেকে বেরিয়েছে লম্বা লম্বা রেশমের মতো অনেকগুলি সরু শুঁয়ো। এই শুঁয়োগুলির জন্যই এরা হাওয়ায় ভাসে। হাওয়ায় ভেসে এরা অনেক দূরে উড়ে যায় এবং হাওয়ার বেগ ক’মে গেলে অথবা কোথাও বাধা পেলে মাটিতে পড়ে যায়। যেখানে পড়ে সেখানে জল পেলে এই বীজ থেকে গাছ হয়।

প্রাণীমাত্রেই চেষ্টা করে নিজেকে এবং নিজের বংশকে রক্ষা করতে। বাঁচতে গেলে খাদ্যের দরকার। গাছেরা খাদ্য জোগাড় করে কতক মাটি থেকে এবং কতক বাতাস থেকে। তবে মাটি আর বাতাস থেকে তারা যা নেয় তা কাঁচা-মালের মতো। গাছ তাকে খাওয়ার উপযোগী ক’রে নেয় সূর্যের আলোর সাহায্যে। তাই গাছকে বাঁচতে হলে চাই মাটির রস, বাতাস আর আলো। সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে এ তিনটি জিনিসই গাছের যথেষ্ট পরিমাণে দরকার। এই তিনটি জিনিস নিয়ে নিজেদের মধ্যে যাতে কাড়াকাড়ি মারামারি না করতে হয়, তাই যেন সব গাছেরই চেষ্টা ফাঁকা জায়গায় থাকবার।

কোনো-একটি গাছের বীজ দূরে ছড়িয়ে না প’ড়ে কেবলই যদি তার গুঁড়ির কাছে মাটিতে জমা হতে থাকে, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই গাছে গাছে বেজায় ঘেঁষাঘেঁষি হবে। তাদের পক্ষে তখন প্রাণ বাঁচানো কঠিন হয়ে উঠবে। মাটির ভিতরে শিকড়ে শিকড়ে যাবে জড়িয়ে। আর, একই জায়গা

থেকে এতগুলি শিকড়ের একসঙ্গে খাদ্য-সংগ্রহের ফলে সে জায়গার মাটিতে খাদ্যের হবে অভাব। উপরেও ডালে ডালে পাতায় পাতায় ঠাসাঠাসির ফলে আলো বাতাস কেউই যথেষ্ট পরিমাণে পাবে না। জন্তুদের কিন্তু ভারি সুবিধে। তারা চলাফেরা করতে পারে। তাই কোনো এক জায়গায় খাদ্যের অভাব বা অন্য কোনোরকম অসুবিধে হলেই সে-জায়গা ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে যেতে পারে। গাছেরা কিন্তু একবার যেখানে জন্মায় সে-জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে না। তাই যেন তারা গোড়াতেই সাবধান। বীজ-অবস্থাতেই যাতে তারা দূরে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তার ব্যবস্থা যেন আগে থাকতেই করা থাকে।

যে বুড়ির-সুতোর কথা আগে বলা হয়েছে তারা একটিমাত্র গাছের বীজ নয়, তারা নানা জাতের গাছের বীজ। আকন্দ, ছাতিম, কুরচি, মালতী প্রভৃতি অনেক গাছের বীজই তুলোর মতো শুঁয়োর সাহায্যে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। শিমুল-কাপাসের ফল পাকলেই আমরা তুলো পেড়ে নিই আমাদের দরকারে। তা না হলে তাদের বীজও বুড়ির-সুতো হয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে দেখা যেত।

আর-এক জাতের বীজও হাওয়ায় উড়ে যায়। এদের বলা চলে ডানাওয়ালা বীজ। গায়ে এদের ডানা থাকে, যেমন সজনে, মেহগনি ও মুচকুন্দ ফলের বীজ। মাধবী ও শালের বেলায় বীজসুদ্ধ আস্ত ফলটি হাওয়ায় ভাসে, কারণ এদের ডানা বীজের গায়ে না হয়ে ফলের গায়ে হয়। মাধবীফলের ডানা তিনটি, আর শাল-ফলের হয় পাঁচটি। এই ডানায় ভর ক'রে এদের বীজসুদ্ধ ফল হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে খেতে উড়ে দূরে গিয়ে পড়ে। বর্ষাকালে ফলের আবরণ প'চে গেলে বীজ থেকে এদের গাছ বেরোয়। সিসুগাছের ফল শুঁটিজাতীয়। বীজসুদ্ধ সমস্ত শুঁটিটাই তার ডানার মতো চ্যাপটা ও পাতলা, তাই আস্ত ফলটাকেই হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়।

যে-সব গাছ জলে বা জলের ধারে হয় তার মধ্যে অনেকেরই বীজ-ছড়ানোর কাজ করে জল। নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি গাছ সাধারণত জলাশয়ের ধারে হয়। ঝুনো হলে এদের ফল বীজসুদ্ধ জলে পড়ে যায়। গায়ে ছোবড়া থাকায় এরা বেশ সহজেই জলে ভেসে থাকতে পারে। ভাসতে ভাসতে ক্রমে এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে ঠেকে। তার পর সেই ফলের আবরণ ভেদ ক’রে সেখানকার মাটিতে নতুন চারা জন্মায়। নারিকেল গাছ সাধারণত সমুদ্রতীরে হয় এবং সমুদ্রের জলে ভেসে অতি সহজেই এর ফল এক দেশের তীর থেকে আর-এক দেশের তীরে গিয়ে ওঠে। ভারত-মহাসাগর বা প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে তাই নারিকেল গাছের এত ছড়াছড়ি।

পাকা দোপাটির ফল ফাটে ফট্ ক’রে। এই ঝাঁকুনি দিয়ে ফেটে যাবার ফলে তার সরষের মতো একরাশ বীজ ছিটকে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পড়ে। এমনি ক’রে বীজ ছড়ানোয় আমরুল, ভেরেণ্ডা, কাঞ্চন, এরাও দোপাটির দলে। বীজ ছড়াবার কাজে বাইরের কিছুর সাহায্য এ-সব গাছের দরকার হয় না।

কার্তিক-অঘ্রান মাসে মাঠে বেড়ালে কাপড়ে চোরকাঁটা লাগে। এই চোরকাঁটা কয়েকরকম ঘাসের ফল, এদের ভিতর থাকে বীজ। মানুষ ও অন্যান্য জন্তুদের গায়ে লেগেই এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। চর্‌চরি বা আপাঙের ছোটো ছোটো ফলও এরকম করেই ছড়ায়। বাঘনখের ফল আপনার বাঁকানো ধারালো নখজোড়া দিয়ে গোরু-মোষের গায়ে ঝুলতে ঝুলতে যায়।

আম, জাম, খেজুর, কাঁঠাল ইত্যাদি শাঁসওয়ালা ফল অনেক জীবেরই খাদ্য। খেতে গিয়ে এলোমেলো আঁটি ফেলে তারাই এদের ছড়িয়ে দেয়। পুরানো দেয়ালে, ছাদের কার্নিশের ফাঁকে এবং তালগাছের গায়ে প্রায় বট-অশ্বত্থের গাছ হতে দেখা যায়। কাক, শালিক ইত্যাদি পাখিই তার জন্য দায়ী। পাখিরা

বট-অশ্বত্থের ফল খায়, কিন্তু তার বীজ এদের পেটে হজম হয় না, মলের সঙ্গে আস্তই বেরিয়ে আসে। ফলে অনেক সময় নানা অস্থানেও এ-সব গাছ হয়। কুল, পেয়ারা, খেজুর, এদের বীজও অনেক সময় জন্তুর পেটে হজম হয় না। তারাই এদের চারিদিকে ছড়ায়।

অনেক গাছ মানুষের হাত দিয়ে পৃথিবীতে নানা জায়গায় ছড়িয়েছে। অনেক গাছ আমাদের দেশে আগে কোনোদিনই ছিল না, অথচ এখন প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এদের এনেছে মানুষ। আনারস, পেঁপে, আলু, তামাক, লঙ্কা ইত্যাদি গাছ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যে কচুরিপানা আজ আমাদের দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে প'ড়ে নদী খাল বিলের সর্বনাশ করছে তার আমদানিও বেশি দিনের নয়। শোনা যায়, একজন বিদেশী ভদ্রমহিলা এর সুন্দর নীল ফুলের রূপে মুগ্ধ হয়ে আমাদের দেশে একে এনেছিলেন সুদূর বিদেশ থেকে।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে,
বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভ'রে ভ'রে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা,
রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্য-দোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে,
সকল ধরা হেসে ওঠে—
অঘ্রানেরই সোনার রোদে, পূর্ণিমারই চন্দ্রে।

মাতা, মেতে ওঠা - to become intoxicated with joy

আবদুল মাঝির গল্প

আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি ; সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ, আর কচ্ছপের ডিম। সে আমার কাছে গল্প করেছিল, একদিন চত্তির-মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকো ডোবে-ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধ'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি।

গল্পটা এত শিগ্‌গির শেষ হল, আমার পছন্দ হল না। নৌকোটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্‌পই নয়। বারবার বলতে লাগলুম, তার পর ? সে বললে, তার পর সে এক কাণ্ড। দেখি এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফজোড়া। ঝড়ের সময় সে উঠেছিল ওপারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড়গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে। খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়াল আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জ'মে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল-টক্‌টকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম, আও বাচ্ছা। সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্যে যতই ছট্‌ফট্ করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, আবদুল, সে মরে গেল নাকি। আবদুল বললে, মরবে, তার বাপের সাধ্যি কী। নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো। ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই

দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।

আমি বললুম, আচ্ছা বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমির? আবদুল বললে, জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয়, ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কাঁচিবেদেনী ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাঁখারি চাঁচছে, ছাগলছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাং ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনী একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ঐ দানো-গিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগাল। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, তার পরে? আবদুল বললে, তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে।

ভুলুরাম শর্মা

পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শর্মা সে
টেরিটিবাজারে গেল মনিবের ফর্মাশে।
মরেছে অতুল মামা, আজি তারি শ্রাদ্ধের
জোগাড় করতে হবে নানাবিধ খাদ্যের।
বাবু বলে, "ভুলো না হে, আরো চাই দর্‌মা।"
"ভোলা কি সহজ কথা" বলে ভুলু শর্মা।

কাঁকরোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে।
শাঁক-আলু কচু কিনা পারে না সে চিনতে।
বকুনি খেয়েছে যেই মাছওলা মিন্‌সের
তাড়াতাড়ি কিনে বসে কামরাঙা তিন সের।

বাবু বলে, "কামরাঙা এতগুলো হবে কী।"
ভুলু বলে, "কেন, আমি শুনি নাই তবে কি।
দেখলেম কিনছে যে ও-পাড়ার সরকার,
বুঝলেম নিশ্চয় আছে এর দরকার।"
কানে গুঁজে নিয়ে তার হিসাবের লেখনী
বাবু বলে, "ফিরে দিয়ে এসো তুমি এখনি।"

মনিবের হুকুমটা শুনল সে হাঁ ক'রে।
ফিরে দিতে চলে গেল কিছু দেরি না ক'রে।

বললে সে, "দোকানিকে যা করেছি জব্দ—
ফলগুলো ফিরে নিতে করেনি টুঁ শব্দ।"
বাবু কয় "টাকা কই" টান দিয়ে তামাকে।
ভুলু বলে, "সে-কথাটা বল'নি তো আমাকে।
এসেছি উজাড় ক'রে বাজারের ঝুড়িটা।
দোকানির মাসি ছিল, হেসে খুন বুড়িটা।"

কুকুর সম্বন্ধে দু-চার কথা

আমরা আমাদের চার ধারে যে-সব গৃহপালিত পশু দেখতে পাই এদের পূর্বপুরুষরা সকলেই এক সময়ে বন্য ছিল। পোষ-মানানো অবস্থায় এই পশু-দের অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। আজ এইরকম কোনো গৃহপালিত পশুর পাশেই তার কোনো-একটি বন্য জ্ঞাতিকে যদি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তবে এরা দুজনেই যে এক বংশে জন্মগ্রহণ করেছে তা বুঝে নিতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবে। মানুষ কেমন ক'রে বন্য জন্তুকে পোষমানা অবস্থায় রেখে এতখানি তাকে বদলে ফেলল তার খোঁজ নিতে গেলে অনেক তথ্য জানা যাবে। সবরকম জন্তুর কথা আলোচনা করা চলবে না। শুধু কুকুরের সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর এখন পেলে পরে অন্যান্য পশুদের কথা বুঝতে সুবিধা হবে।

প্রায় দু শো জাতের কুকুরের কথা জানা গেছে। তার মধ্যে মাত্র কয়েক জাতের কথাই বর্তমান প্রবন্ধে বিশেষ করে বলা হবে।

যে-সব বন্য জন্তুকে আমরা এখন নেকড়ে বলি অনেক আগের কালে তাদেরই কতকগুলিকে মানুষ ধ'রে ধ'রে পোষ মানিয়েছিল। এই পোষ মানাতে অল্প দিন লাগেনি। ডার্‌উইন নামে ইংলণ্ডে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর নানা স্থানে নানা কালে নানা জাতের নেকড়েকে পোষ মানানো হয়েছিল। তাদেরই সন্তান-সন্ততিরা নানা জাতের কুকুরের আকারে আজ রয়েছে মানুষের ঘরে।

মানুষ কেন নেকড়েকে পোষ মানাতে আরম্ভ করল, সে-কথা জানতে গেলে মানুষ বহু সহস্র বৎসর পূর্বে কেমন অবস্থায় থাকত তা জানতে হয়। এখন শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে, মানুষ প্রথম যখন নেকড়েকে পোষ

মানাতে চেষ্টা করেছিল তখন সে তার একটা শখ মেটানোর কথাই ভেবেছিল। এক সময় ছিল যখন মানুষ শহর, গ্রাম, এ-সব তৈরি ক'রে বাস করতে তো শেখেইনি, ভালো ক'রে থাকবার ঘরও তৈরি করতে শেখেনি। তখনকার দিনে মানুষ ছিল ভারি নিঃসঙ্গ, চার ধারে তার নানা রকমের শত্রু। এমনি দিনে কুকুর বা নেকড়েকে মানুষ ক'রে নিল তার সঙ্গী। এখনো যেমন আমরা

এক রকমের কুকুর পুষি শখের জন্য, তখনো তেমনি হয়েছিল। তার পর মানুষ যেমন ক্রমে ক্রমে তার কাজকর্ম বদলাতে লাগল, কুকুরও তেমনি তাদের নানারকম কাজে আসতে লাগল।

একরকম কুকুরের নাম 'কলি'। মানুষের মধ্যে যেমন আমরা বুদ্ধি ও সভ্যতায় এক জাতীয় লোককে আর-এক জাতীয় লোকের চাইতে বেশি অগ্রসর ব'লে থাকি, কুকুরের সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। কলিরা, বলা যেতে পারে, খুব সভ্য। এদের আদিবাস ছিল স্কটল্যাণ্ডে। ভেড়া চরানো, হারানো ভেড়া

খুঁজে বের করা, আর ভেড়ার খুব বড়ো বড়ো পালকে তাড়িয়ে-তুড়িয়ে দলবদ্ধ ক'রে রাখতে এর দোসর মেলে না। অনেকে বলে যে, কলির মতো কুকুর মেষপালকদের সহায় না হলে, স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়-পর্বতের উপর যে-ভাবে মেষপালন হয়ে থাকে তা সম্ভবই হতে পারত না। নেকড়েরা ভেড়া খেয়ে থাকে, এ কথা আমরা জানি। সেই নেকড়েরই বংশধর কেউ ভেড়ার রক্ষণাবেক্ষণ করছে, এ ব্যাপারটায় সহজে বিশ্বাস হতে চায় না। মানুষ কুকুরের ইস্কুলে খুব চমৎকার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে ব'লেই এ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

বুদ্ধিতে ও আচরণে কলিরই মতো উন্নত আর-এক জাতের কুকুর আছে। তাদের নাম সেণ্ট্ বার্নার্ড। য়ুরোপের আল্প্স্ পর্বতের এক গিরিপথের নাম সেণ্ট্ বার্নার্ড। সে জায়গাটা আট হাজার ফুটের চাইতেও উঁচু। বৎসরের অনেক মাসই সেখানটা বরফে ঢাকা থাকে। অনেক শতাব্দী পুর্বে রোম ছিল সমস্ত খৃস্টানদের তীর্থস্থান, যেমন হিন্দুদের কাশী। সেণ্ট্ বার্নার্ড গিরিপথ দিয়ে অসংখ্য লোক যাতায়াত করত ব'লে ওখানে অনেক পান্থশালা ছিল, আমাদের দেশে যেমন ধর্মশালা আছে তেমনি। সেই-সব ধর্মশালার সাধুরা একরকম কুকুর পুষতেন। তাদের নাম হয়েছিল সেণ্ট্ বার্নার্ড কুকুর। বরফের ভিতর চলতে চলতে পাহাড়-পর্বতের মধ্যে পথিকরা অনেক সময় শীতে কাতর হয়ে পড়ত। কখনো কখনো তারা পথও হারিয়ে ফেলত। এই-সব পথিকদের জীবনরক্ষার জন্য, অথবা তাদের পথ দেখিয়ে কোনো নিকটবর্তী ধর্মশালায় নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে, সাধুরা এই-সব কুকুর পাহাড়ের মধ্যে ছেড়ে রাখতেন। সাধারণত এরা দুজনা একসঙ্গে থাকত। এরা যে-রকম কাজ করে তাতে এদের 'দুটি' না ব'লে 'দুজনা' বলতেই ইচ্ছা করে। একজনার গলাবন্ধ জড়িয়ে বাঁধা থাকত একটা ব্র্যাণ্ডির পাত্র, আর-একজনার পিঠে বাঁধা থাকত একটা

কম্বল। এমনি অবস্থায় ঘুরে ঘুরে এরা যে কত পথিকের জীবনরক্ষার কারণ হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। তীর্থ করতে রোমে যাওয়া খৃস্টানদের মধ্যে এখন কমে গেছে। এই গিরিপথ দিয়ে লোকের যাতায়াত কিন্তু কমেনি। সেণ্ট বার্নার্ড কুকুর এখনো সেখানে পথিকের বন্ধু। এদের চোখের দৃষ্টিতে ও মুখের ভাবে এমন একটা মাধুর্য ও মহিমার ছাপ আছে যে, সেদিকে তাকালে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না। কয়েক বৎসর আগে এই জাতীয় একটি কুকুর মারা গেলে তার গলায় একটা পদক দেখা যায়। তার থেকে জানা যায়, সে কুকুরটি তার জীবিতকালে বাইশজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছিল।

সমব্যথী

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা—
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?
সত্যি করে বল্,
আমায় করিসনে মা, ছল—
বলতে আমায় "দূর দূর দূর,
কোথা থেকে এল এই কুকুর" ?
যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।
আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে।

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে—
তবে পাছে যাই মা, উড়ে
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে ?
সত্যি করে বল্,
আমায় করিসনে মা, ছল—
বলতে আমায় "হতভাগা পাখি
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি" ?
তবে নামিয়ে দে মা,
আমায় ভালোবাসিস নে, মা।
আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চ'লে।

মেঘমালা

বিন্ধ্য পাহাড়ে মেঘেদের বর্ষা-উৎসব। দলে দলে আকাশ ঘিরে কালো মেঘ এসেছে ভিড় ক'রে; কারও হাতে বিদ্যুতের মশাল, কেউ-বা গুরুগুরু শব্দে মাদল বাজাচ্ছে। মেঘলোকের রাজা, অম্বুদ তাঁর নাম। আজ তাঁরই সভায় আসর বসেছে। কথা ছিল, রাজকন্যা মেঘমালা এ উৎসবে নাচবে। বেলা বয়ে যায়, মেঘমালার দেখা নেই। অম্বুদরাজ আসর ভেঙে দিলেন, যারা নাচ দেখতে এসেছিল তারা সকলে যে যার বাড়িতে ফিরে গেল।

এদিকে হয়েছে কী, উৎসবের কথা মেঘমালার মনেও নেই। মহাসাগরের ঢেউয়ে দুলে দুলে সে তখন জলকেলি করছে। হঠাৎ যখন তার খেয়াল হল তখন সময় উৎরে গেছে। বিন্ধ্য পাহাড়ে ফিরে এসে সে দেখে, সব নিঝুম, বাতি গেছে নিভে। কেবল অম্বুদরাজ তাঁর সভায় ব'সে আছেন গালে হাত দিয়ে; রাগে দুঃখে তাঁর চোখ লাল, মুখ গম্ভীর।

মেয়ের পায়ের শব্দে তিনি মুখ তুলে চাইলেন। অভিশাপ দিয়ে বললেন, "আজ থেকে মেঘলোক হতে তোমার নির্বাসন। বরুণরাজার দ্বীপে তুমি জেলের মেয়ে হয়ে জন্মাবে। সেবা ও যত্নে যদি তোমার জেলে মা-বাবাকে খুশী করতে পার তবে চোদ্দ বছর পরে আবার তুমি মেঘলোকে ফিরে আসতে পারবে।"

বরুণরাজার দ্বীপে এক গরিব জেলের বাড়িতে মেঘমালা জন্ম নিল। জেলে ও জেলেনীর বুড়ো বয়সের ঐ একটি মেয়ে। আদর ক'রে বাপ-মা নাম দিল সাগরী। মেয়ে রূপে যেমন গুণেও তেমনি। সাগরীর সেবাযত্নে তার

বাপ-মা খুব খুশী। তার সবই ভালো, কেবল বর্ষাকালে যখন ছায়া আসত ঘনিয়ে পুবের মাঠে, আর গুরুগুরু শব্দে মেঘের মাদল উঠত বেজে, তখন সাগরী বসে থাকত কেমন যেন আনমনা হয়ে।

এইভাবে কেটে গেল বছরের পর বছর। সাগরী এখন তেরো পেরিয়ে চোদ্দয় পা দিয়েছে। আষাঢ় মাসে তার চোদ্দ বছর পূর্ণ হবে।

সেদিন ছিল রবিবার। কোন্ ভোরে উঠে জেলে তার ডিঙিনৌকো ঠেলে মাঝ সমুদ্দুরে চলে গেছে, মাছ ধরে আনতে। মায়ে মেয়েতে উঠোনে বসে জাল বুনছে। এমন সময় এল কাল-বোশেখির ঝড়। ঈশান কোণ থেকে সিঁদুরে মেঘ হু হু ক'রে দৈত্যের মতো ছুটে এল, ঢেউগুলো ভয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল এ ওর গায়ে, গাঙচিলগুলো পাখার ঝাপট দিতে দিতে অতি কষ্টে ডাঙার দিকে উড়ে এল। ঝড় আসছে দেখে জেলের দল এল যে যার বাড়িতে ফিরে। ফিরল না কেবল সাগরীর বাবা।

সাগরী আর তার মা প্রদীপ জ্বালিয়ে সারা রাত চুপ করে বসে রইল। ভোর হয়-হয় এমন সময় কে যেন দরজা ঠেলে ডাকল, "সাগরী!" তাড়াতাড়ি দরজা খুলে সাগরী দেখে তার বাবা, আর কোলে তার পনেরো-ষোলো বছরের সুন্দর একটি ছেলে। জেলেনী বিছানা পেতে ছেলেটিকে শুইয়ে দিল; দেহে তার চেতনা নেই, সমস্ত শরীর নীল হয়ে গেছে। সাগরীর সেবায় অনেকক্ষণ পরে তার জ্ঞান হল, চোখ মেলে চেয়ে দেখে সে একটি কুঁড়ে ঘরে শুয়ে আছে, পাশে তার পরমা সুন্দরী কন্যা।

জেলে তখন সব কথা বলল।—

সে যখন মাঝদরিয়ায় তখন এল ঝড়। নৌকো ডোবে আর-কি! যত সে ডাঙার দিকে এগোতে চায় ততই পাহাড়ের সমান উঁচু উঁচু ঢেউ তার

পথ আটকে দাঁড়ায়। একেবারে সে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছে, হঠাৎ দেখে একটা কাঠ এসে ডিঙির গায়ে ঠেকল, সেটা আঁকড়ে ধ'রে একটি ছেলে ভেসে চলেছে। জেলে তাকে তার ডিঙিতে উঠিয়ে নিল। ঝড় থামলে পর তিন প্রহরের চেষ্টায় জেলে বাড়ি ফিরে এসেছে, প্রাণ হাতে ক'রে।

ছেলেটির কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে তারা জানতে পারল, সে আর কেউ নয়, বরুণদ্বীপেরই রাজার ছেলে, নাম তার অর্ণবকুমার। বন্ধুদের সঙ্গে সে ময়ূরপঙ্খি নৌকো চ'ড়ে বেড়াতে গিয়েছিল সমুদ্রে। ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকো ফেটে চৌচির। ডুবন্ত ময়ূরপঙ্খির একটা পাটাতন ধ'রে কোনোমতে সে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছিল। তারপর যে কী হল তার মনেই নেই, সঙ্গীদেরই বা কী দশা হয়েছে তাও সে জানে না।

রাজবাড়িতে ফেরার আগে জেলের হাতদুটো ধ'রে অর্ণব বলল, "তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ। কী দিয়ে তোমার ঋণ শোধ করি জানি না।"

রানীমার হুকুমে জেলেকে দেওয়া হল একটা মস্ত সাতমহলা বাড়ি। সাগরের ঝিনুক দিয়ে তৈরি তার সিঁড়ি, প্রবাল দিয়ে গাঁথা তার দেয়াল। দাস-দাসী ধনদৌলতের অভাব নেই। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। জেলে জেলেনীর সুখের অবধি নেই। এর উপর আবার যখন দিনকতক পরে রাজকুমার এসে বলল যে সে সাগরীকে বিয়ে করতে চায়, তখন জেলেনীর আনন্দ দেখে কে। সে তাড়াতাড়ি মেয়েকে এই সুখবর দিতে গেল।

মায়ের কথা শুনে সাগরী বলল, "এ বিয়ে তো হতে পারে না, মা।"

এতদিন সে তার পূর্বজন্মের কথা কাউকে বলেনি। আজ সে সব কথা খুলে বলল। মা তখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলল, "আমি জানতুম অত সুখ আমার কপালে সইবে না, জেলেবাড়িতে কি এমন মেয়ে জন্মায়।"

জেলেনী খুব কাঁদতে লাগল। জেলে এ-সব কথা শুনে বলল, "সে হতে পারে না। এই চোদ্দ বছর সাগরী একটি দিনের জন্যে আমাদের দুঃখ দেয়নি। যাবার সময় হলে ও মেঘলোকে ফিরে যাবে। কিন্তু রাজপুত্তুরকে আমি কী ব'লে বোঝাই।"

সাগরী চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, "ওঁকে বোলো যে, মেয়ে পণ করেছে, যদি কেউ মেঘলোক থেকে বজ্রমণি এনে দিতে পারে তবে তাকেই সে বিয়ে করবে, আর কাউকে নয়।"

আষাঢ় মাসের শেষ দিন। ভোর বেলা উঠে সাগরী সমুদ্রের জলে স্নান ক'রে ধূপছায়া রঙের শাড়ি পরল, মেঘের মতো কালো চুল ঢেকে মাথায় দিল রামধনু রঙের ওড়না। জেলে ও জেলেনীকে প্রণাম ক'রে সে চলে গেল মাঠের শেষে, যেখানে আকাশ এসে মিশেছে মাটির সঙ্গে। সেখানে গিয়ে দু হাত তুলে দাঁড়াতেই মেঘের রথ এসে থামল। সাগরীকে তুলে নিয়ে রথ চলল কত নদী, কত পাহাড়, কত দেশ পেরিয়ে সেই হিমালয়ের দিকে— যেখানে অম্বুদরাজার দেশ।

মেঘলোকে নেমে মেঘমালা দেখে, হুলুস্থুল কাণ্ড, বজ্রমণি চুরি করতে গিয়ে কে একজন বিদেশী ধরা পড়েছে; আজ তার বিচার। মেঘমালা সোজা রাজসভায় গেল তার বাবাকে প্রণাম করতে। প্রণাম ক'রে যেই না সে তার মাথা তুলেছে অমনি কে একজন ব'লে উঠল, "একি, সাগরী!"

মেঘমালা দেখে অর্ণবকুমার, হাতে পায়ে তার শেকল বাঁধা। অর্ণবই এসেছিল তার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে বজ্রমণি চুরি করতে। আজ তারই বিচার।

অম্বুদরাজ মেয়ের মুখে সব কথা শুনে অর্ণবকে কেবল যে মুক্তি দিলেন তা নয়, বললেন, "আমি বুড়ো হয়েছি, আর দেশে দেশে ছুটে বেড়াতে ভালো লাগে না। মেঘমালার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে অর্ণবকে মেঘলোকের রাজা ক'রে দেব। তার পর আমি ছুটি নেব।"

রাজার আদেশে শ্রাবণ-পূর্ণিমার রাত্রে বিয়ের দিন স্থির হল। সেদিন কী ঘনঘটা! এ-দেশ থেকে, ও-দেশ থেকে মেঘের দল ভিড় ক'রে এল; কারও হাতে বিদ্যুতের মশাল, কেউ-বা গুরুগুরু শব্দে মাদল বাজিয়ে সারা আকাশ মুখর করে তুলল।

বিয়ে দিয়ে অম্বুদরাজ গৌরীশৃঙ্গে চলে গেলেন ধ্যানধারণা করতে। অর্ণব ও মেঘমালা মেঘলোকের রাজা ও রানী হয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল।

one who lost the way

পথহারা

আজকে আমি কত দূর যে
গিয়েছিলেম চ'লে।
তুমি যত ভাবতে পার
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা
তোমায় ব'লে ব'লে।

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর।
মাঝখানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ, কত যে খেত,
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুরবাড়ি,
ছাড়িয়ে তালিমপুর।

পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে
সাত-কুশি সব গ্রাম,
ধানের গোলা গুনব কত
জোদ্দারদের গোলার মতো,
সেখানে যে মোড়ল কারা
headman who
জানিনে তার নাম।

একে একে মাঠ পেরোলুম
কত মাঠের পরে।
তার পরে উঃ, বলি মা, শোন্,
সামনে এল প্রকাণ্ড বন,
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
gęsia skórka dostawać
গা ছম্-ছম্ করে।

জামতলাতে বুড়ি ছিল,
বললে "খবরদার"!
আমি বললেম বারণ শুনে
"ছ-পণ কড়ি এই নে গুনে",
যতক্ষণ সে গুনতে থাকে
হয়ে গেলেম পার।

কিছুরই শেষ নেই কোথাও
আকাশ পাতাল জুড়ি।
যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো-মুখোশ-পরা আঁধার
সাজল জুজুবুড়ি।

খেজুর গাছের মাথায় ব'সে
দেখছে কারা ঝুঁকি।
কারা যে সব ঝোপের পাশে
একটুখানি মুচকে হাসে,
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো
কেবল মারে উঁকি।

আমায় যেন চোখ টিপছে
বুড়ো গাছের গুঁড়ি।
লম্বা লম্বা কাদের পা যে
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে—
মনে হচ্ছে, পিঠে আমার
কে দিল স্থড়্স্থড়ি।

ফিস্‌ফিসিয়ে কইছে কথা,
দেখতে না পাই কে সে।
অন্ধকারে দুদ্দাড়িয়ে
কে যে কারে যায় তাড়িয়ে,
কী জানি কী গা চেটে যায়
হঠাৎ কাছে এসে।

ফুরোয় না পথ; ভাবছি আমি
ফিরব কেমন ক'রে।
সামনে দেখি কিসের ছায়া—
ডেকে বলি, "শেয়াল ভায়া,
মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দে-না মোরে।"

কয় না কিছুই, চুপটি ক'রে
কেবল মাথা নাড়ে।
সিঙ্গিমামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন এসে ডেকে,
কে জানে মা, হালুম ক'রে
পড়ল যে কার ঘাড়ে।

বল্ দেখি তুই, কেমন ক'রে
ফিরে পেলেম মাকে।
কেউ জানে না কেমন করে।
কানে কানে বলব তোরে?—
যেমনি স্বপন ভেঙে গেল
সিঙ্গিমামার ডাকে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সে আশি বছর পূর্বে। আজ তাঁর কথাই তোমাদের বলব।

দেবেন্দ্রনাথ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দ্বারকানাথ অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন, লোকে তাই তাঁকে 'প্রিন্স্' বা রাজপুত্র বলত। ১২২৪ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার; সেদিন সকালে আকাশে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। দ্বারকানাথের বাড়িতে উৎসবের মহা ধুম। ঘন ঘন শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে, হুলুধ্বনি হচ্ছে, এমন সময় দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর মায়ের নাম দিগম্বরী দেবী।

দেবেন্দ্রনাথ নিজের জীবনচরিতে লিখেছেন, তিনি তাঁর পিতামহী অলকাসুন্দরীর কাছে মানুষ হয়েছিলেন। এই দিদিমা তাঁর অত্যন্ত ধর্মশীলা ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ঠাকুরপূজায় ফুলের মালা গেঁথে দিতেন, স্নানের পর ছাতের রোদে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে সূর্য-অর্ঘ্যের মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, কালীঘাটে দেবদর্শনে যেতেন, এমনকি নিজের খাবার ফেলে তাঁর হাতের হবিষ্যান্ন বেলা দুপুরে খেতেন। শোওয়া-বসা, নাওয়া-খাওয়া সর্বদা তাঁর সঙ্গে করতেন ব'লে শৈশব থেকেই দেবেন্দ্রনাথ ধর্মের আবহাওয়ায় মানুষ। তাঁর মনে তাই ছেলেবয়সেই দেবতার প্রতি গভীর এক ভক্তির ভাব জেগেছিল।

দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন একুশ বছর, দিদিমা তাঁর মারা যান। গঙ্গাতীরে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। দিদিমা 'হরিবোল' ব'লে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে মারা গেলেন। দেবেন্দ্রনাথের মনে হল, দিদিমা যেন তাঁকে ঈশ্বরের কথা ব'লে গেলেন।

বালক বয়সেই অনন্ত আকাশের গায়ে অগণ্য নক্ষত্রের শোভা দেখে তাঁর মনে হত, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড কোনো সামান্য দেবদেবীর হাতে তৈরি হতেই পারে না। যিনি এর স্বৃষ্টিকর্তা তিনিও নিশ্চয় অনন্ত এবং সর্বশক্তিমান।

ঈশ্বরের কথা দেবেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই চিন্তা করতে লাগলেন। ধনীর পুত্র হয়েও টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তিতে তাঁর একেবারেই টান ছিল না। দিদিমার মৃত্যুর পর মন তাঁর খুব খারাপ, একদিন বৈঠকখানায় ব'সে তিনি বললেন, "আজ আমি কল্পতরু হলাম, আমার কাছে যে যা চাইবে সাধ্যমতো তাকে আমি তাই দেব।" বড়ো বড়ো দেয়াল-জোড়া আয়না, দামি দামি ছবি, ঘরের যত শৌখিন আসবাবপত্র, যে যা চাইল তিনি অনায়াসে বিলিয়ে দিলেন। তবু যেন তৃপ্তি হল না। মনে হতে লাগল, সর্বস্ব দান করতে হবে, ঈশ্বরকে পেতে হবে।

রাজা রামমোহন রায়ের নাম তোমরা অনেকে শুনে থাকবে। ব্রাহ্মসমাজ ইনিই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দ্বারকানাথের সঙ্গে রাজার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দেবেন্দ্রনাথকেও তিনি খুব ভালোবাসতেন। এই পারিবারিক পরিচয়ের ফলে দেবেন্দ্রনাথও রাজাকে বালক বয়স থেকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। রাজার সেই আশ্চর্য প্রভাব তাঁর জীবনে যুবা বয়সে সার্থক হল। ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ, দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ছাব্বিশ বছর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে তিনি ও তাঁর এক ছোটো ভাই গিরীন্দ্রনাথ দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। মহর্ষির এই দীক্ষার কথা স্মরণ ক'রে শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের শুভদিনে আজও উৎসব হয় এবং মন্দিরের পাশের মাঠে মেলা বসে।

দীক্ষা নেবার পরে বছর-তিনেক মাত্র কেটেছে। ১২৫৩ সালের শ্রাবণ মাস। ঘোর বর্ষায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী সারদা দেবী ও বড়ো তিন পুত্রকে নিয়ে নৌকোয় ক'রে গঙ্গায় বেড়াতে বেরিয়েছেন। হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠল। কোনো

মতে বিপদ কাটিয়ে তাঁরা সবেমাত্র ডাঙায় উঠেছেন, এমন সময় ডিঙিনৌকোয় ক'রে তাঁদের বাড়ির পুরানো খানসামা এসে এক চিঠি দিল। গোধূলির আবছা আলোয় দেবেন্দ্রনাথ পড়লেন যে, ইংলণ্ডে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মাথায় যেন বজ্রপাত হল। তাড়াতাড়ি তিনি কলকাতায় ফিরলেন।

সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে পড়ল। ন্যায়ের পথ কিন্তু তিনি জীবনে কোনোদিন ত্যাগ করেননি। 'কার ঠাকুর কোম্পানি' নামে এক বিরাট ব্যবসায়ে দ্বারকানাথ ছিলেন আট-আনা অংশীদার। উইলে তিনি সে-অংশ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিয়ে গিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু তা একা না রেখে তাঁর ছোটো দুই ভাইয়ের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নিলেন।

পিতার হঠাৎ মৃত্যুর ফলে বিরাট সম্পত্তির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বিরাট ঋণেরও উত্তরাধিকারী হলেন। প্রায় এক কোটি টাকা দেনা। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে দৃঢ় সংকল্প ছিল, "পথে বসতে হয় সেও স্বীকার, তবু পরের ধনে লোভ করব না।" যে-ধন পরের প্রাপ্য সে তো পরেরই ধন। ঋণশোধের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি পাওনাদারদের হাতে তুলে দিলেন। এক এক ক'রে সমস্ত বিষয়সম্পত্তির তালিকা করা শেষ হল। তালিকাটি যখন পড়া হচ্ছে দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ তাঁর আঙুলের বহুমূল্য আংটিটা দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এই আংটিটাও তোমাদের।" পাওনাদারেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললে, "আপনার অসাধারণ সাধুতার পুরস্কার-স্বরূপ ঐ আংটিটা আপনিই রাখুন।"

উইলে দ্বারকানাথ গরিবদের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সে-টাকা আইনত কেউ দাবি করতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথ শুধু দেনা শোধ করেই ক্ষান্ত হলেন না, পিতার কথার মর্যাদা রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় দানের টাকাও তিনি শোধ করলেন।

দেবেন্দ্রনাথের এই-যে একে একে সর্বস্ব দান, এ যেন এ যুগে এক 'বিশ্বজিৎ যজ্ঞ'।

আরম্ভ হল এবার রাজার ছেলের সরল জীবনযাপনের পালা। গাড়িঘোড়া দাসদাসী বিদায় হল। দেবেন্দ্রনাথ ঘরে বাস ক'রে সন্ন্যাসী

হলেন। সব ঐশ্বর্য হারিয়ে এত দিনে তিনি যেন প্রাণে তৃপ্তি পেলেন। জীবন আনন্দে কাটতে লাগল শাস্ত্র-আলোচনায়, ঈশ্বর-চিন্তায় ও ব্রাহ্মসমাজের সেবায়।

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র জন্ম হয় দেবেন্দ্রনাথেরই আগ্রহে ও চেষ্টায়। এই সভার কথা বড়ো হয়ে তোমরা শুনবে এবং পুরানো 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ও হয়তো একদিন পড়বে। তখন তোমরা দেখবে, শুধু ধর্মে নয়, বাংলাভাষা ও

সাহিত্যের উন্নতির জন্যও তিনি সাধনা করেছেন এবং সে ক্ষেত্রেও তাঁর দান বড়ো কম নয়। অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করার আগে দেবেন্দ্রনাথের নাম বাঙালী-মাত্রকেই স্মরণ করতে হবে।

শেষ বয়সে শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় উপাসনা ক'রে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'। তিনি এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন, সকল জাতের সকল লোক যাতে এখানে নির্জনে ব'সে পড়াশুনা এবং ঈশ্বর-চিন্তা করতে পারে। শান্তিনিকেতন যে তাঁর কত প্রাণের জিনিস ছিল তা তোমরা অনেকেই জান না। কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখনো বার বার বলেছেন, "আহা, যদি শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় শুয়ে সংসার থেকে মুক্ত হতে পারতাম তো বড়ো আনন্দ হত।" তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথকে বললেন, "দ্বিপু, তুমি ছাতিম গাছের একটা চারা আনিয়ে এখানে টবে রেখে দাও। যদি আর শান্তিনিকেতনে না যাওয়া হয় তবে সেই চারা দেখে মনে করতে পারব যে, শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় আছি।"

১৩১১ সালের ৬ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, দুপুরে দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণ অষ্ট-আশি বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কেবলই বলেছেন, "আমি বাড়ি যাব, আমি বাড়ি যাব।" ভগবান যেন তাঁর সেই প্রার্থনা শুনে তাঁকে আপনার কোলে টেনে নিলেন।

গান

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি।

কেয়া-পাতার নৌকো গ'ড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে।
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি।

স্বরলিপি । মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

				ন	
II	সা সা -রা ।	গা পা -ধা ।	পধা -না না ।	ধা পা -া	I
	মে ঘে র্	কো লে ০	রো ০ দ্ হে	সে ছে ০	
	প		ম		
I	গা রা -া ।	গা গা -মা ।	গা রা -গরা ।	-সা -া -া	I
	বা দ ল্	গে ছে ০	টু টি ০ ০	০ ০ ০	
				॥	
I	সা -া রা ।	গা -া রা ।	সা -া -া ।	-া -া -া	I
	আ ০ হা	হা ০ হা	হা ০ ০	০ ০ ০	
		ধ	র্স	র্স	
I	পা -া ধা ।	র্সা র্সা -া ।	র্রা র্সা -া ।	না ধা -না	I
	আ জ্ আ	মা দে র্	ছু টি ০	ও ভা ই	
	ন	ধ	গ		
I	পা -া ধা ।	পা পা -গা ।	পা পা -ধা ।	-না -া -া	I
	আ জ্ আ	মা দে র্	ছু টি ০	০ ০ ০	
I	সা -া রা ।	গা -া রা ।	সা -া -া ।	-া -া -া	II
	আ ০ হা	হা ০ হা	হা ০ ০	০ ০ ০	
			ধ		
II	পা -া গা ।	পা পা -ধা ।	র্সা র্সা -া ।	র্সা র্সা -া	I
	কী ০ ক	রি আ জ্	ভে বে ০	না পা ই	
			র্গ	র্স	
I	র্সা -া র্রা ।	র্রা র্সর্রা -র্গা ।	র্রা -া র্সা ।	না ধপা -া	I
	প থ্ হা	রি য়ে০ ০	কো ন্ ব	নে যা০ ই	

I পা -া ধা । ধর্রা র্সা -া । র্সনা না -র্সনা । নধা পা -া I
কো ন্ মা ঠে যে ০ ছু টে ০০ বে ড়া ই

I পধা ধা -ণা । ণধা পা -া । গা গা -া । -া -া -রা I
স ক ল্ ছে লে ০ জু টি ০ ০ ০ ০

I সা -া রা । গা -া রা । সা -া -া । -া -া -া II
আ ০ হা হা ০ হা হা ০ ০ ০ ০ ০

II প্সা সা -া । সা সা -রা । গা -া গা । গা গা -া I
কে০ য়া ০ পা তা র্ নৌ ০ কো গ ড়ে ০

I গা গা রা । গা গা -ধা । ধা ধা -ণধা । ধ-পা -া -া I
সা জি য়ে দে ব ০ ফু লে ০০ ০ ০ ০

I গা -া রা । গা গা -মা । মগা গা গা । গরা সা -া I
তা ল্ দি ঘি তে ০ ভা সি য়ে দে ব ০

I সা -া ধ্বা । সা সরা -গা । গা গরা -গরা । -সা -া -া I
চ ল্ বে ডু লে০ ০ ডু লে ০০ ০ ০ ০

I পা মপা -গা । পা পা -ধা । ধা -র্সা র্সা । র্সা র্সা -া I
রা খা ল্ ছে লে র্ স ঙ্ গে ধে নু ০

I র্সা র্সা -র্রা । র্রা র্সর্রা -র্গা । র্গর্রা র্সা র্সা । র্সনা ধপা -া I
চ রা ০ ব আ০ জ্ বা জি য়ে বে ণু্ ০ ০

I পা -া ধা । ধর্রা র্সা -া । র্সনা না -র্সনা । নধা পা -া I
মা খ্ ব গা য়ে ০ ফু লে ০র্ রে ণু্ ০

I ধা ধা -ণা । ণধা পা -া । গা গা -া । -া -া -রা I
চাঁ পা র্ ব নে ০ লু টি ০ ০ ০ ০

I রসা -া রা । গা -া রা । সা -া -া । -া -া -া II II
আ ০ হা হা ০ হা হা ০ ০ ০ ০ ০

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

চোদ্দ আনা